সাহিত্য সঞ্চয়ন

বাংলা (প্রথম ভাষা)

নবম শ্রেণি

এই পুস্তকটি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের আর্থিক আনুকূল্যে
কেবলমাত্র সরকারি, সরকার পোষিত ও সরকারি অনুদানপ্রাপ্ত
বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের বিনামূল্যে বিতরণের জন্য।

পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ

প্রথম প্রকাশ: ডিসেম্বর, ২০১৪
দ্বিতীয় সংস্করণ : ডিসেম্বর, ২০১৫
তৃতীয় সংস্করণ : ডিসেম্বর, ২০১৬
চতুর্থ সংস্করণ : ডিসেম্বর, ২০১৭

গ্রন্থস্বত্ব : পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ

প্রকাশক :
অধ্যাপিকা নবনীতা চ্যাটার্জি
সচিব, পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ
৭৭/২ পার্ক স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০ ০১৬

মুদ্রক :
ওয়েস্ট বেঙ্গল টেক্সট বুক কর্পোরেশন
(পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উদ্যোগ)
কলকাতা-৭০০ ০৫৬

ভারতের সংবিধান

প্রস্তাবনা

আমরা, ভারতের জনগণ, ভারতকে একটি **সার্বভৌম সমাজতান্ত্রিক ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্র** রূপে গড়ে তুলতে সত্যনিষ্ঠার সঙ্গে শপথগ্রহণ করছি এবং তার সকল নাগরিক যাতে : সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক **ন্যায়বিচার**; চিন্তা, মতপ্রকাশ, বিশ্বাস, ধর্ম এবং উপাসনার **স্বাধীনতা**; সামাজিক প্রতিষ্ঠা অর্জন ও সুযোগের **সমতা** প্রতিষ্ঠা করতে পারে এবং তাদের সকলের মধ্যে ব্যক্তি-সম্ভ্রম ও জাতীয় ঐক্য এবং সংহতি সুনিশ্চিত করে **সৌভ্রাতৃত্ব** গড়ে তুলতে; **আমাদের গণপরিষদে**, আজ, ১৯৪৯ সালের ২৬ নভেম্বর, **এতদ্দ্বারা এই সংবিধান গ্রহণ করছি, বিধিবদ্ধ করছি** এবং **নিজেদের অর্পণ করছি**।

THE CONSTITUTION OF INDIA

PREAMBLE

WE, THE PEOPLE OF INDIA, having solemnly resolved to constitute India into a SOVEREIGN SOCIALIST SECULAR DEMOCRATIC REPUBLIC and to secure to all its citizens : JUSTICE, social, economic and political; LIBERTY of thought, expression, belief, faith and worship; EQUALITY of status and of opportunity and to promote among them all – FRATERNITY assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the Nation; IN OUR CONSTITUENT ASSEMBLY this twenty-sixth day of November 1949, do HEREBY ADOPT, ENACT AND GIVE TO OURSELVES THIS CONSTITUTION.

ভূমিকা

নবম শ্রেণির জন্য নতুন পাঠক্রম ও পাঠ্যসূচি অনুযায়ী বাংলা সাহিত্যের বই 'সাহিত্য সঞ্চয়ন' প্রকাশ করা হলো। বাংলা ভাষাসাহিত্য পাঠ যে খুবই গুরুত্বপূর্ণ সেকথা সকলেই স্বীকার করেন। ছাত্র-ছাত্রীদের সামনে সহজ ও আকর্ষণীয় করে তুলে ধরার মধ্যেই বিষয়ের সার্থকতা। বিভিন্ন ধরনের সাহিত্যসৃষ্টিকে একত্রিত করা হয়েছে 'সাহিত্য সঞ্চয়ন' বইটিতে। বইটি তাই বৈচিত্র্যের পরিচায়ক। ২০১১ সালে পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক গঠিত একটি 'বিশেষজ্ঞ কমিটি'-কে বিদ্যালয়স্তরের পাঠক্রম, পাঠ্যসূচি এবং পাঠ্যপুস্তকগুলির সমীক্ষা ও পুনর্বিবেচনার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল। তাঁদের ঐকান্তিক চেষ্টায়, নিরলস শ্রমেপাঠক্রম, পাঠ্যসূচি অনুযায়ী 'সাহিত্য সঞ্চয়ন' বইটি তৈরি করা সম্ভব হয়েছে।

ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে প্রেরণা জোগাতে বাংলা বিষয়টিকে সহজ ও আকর্ষণীয় করার লক্ষ্যে যথোপযুক্ত মানসম্পন্ন বইয়ের প্রয়োজন ছিল। এই বইটিতে তথ্যের ভার যাতে সাহিত্যের প্রকাশ ক্ষমতাকে কোনোভাবেই খর্ব না করে সেই দিকে লক্ষ রাখা হয়েছে। পাঠক্রমের মূল বিষয়গুলি সঠিকভাবে অনুধাবন করতে যাতে ছাত্র-ছাত্রীদের সুবিধা হয় তার জন্য বইটিকে যথাসম্ভব প্রাঞ্জলভাবে আকর্ষণীয় করে তোলার চেষ্টা করা হয়েছে। এই বইটির একটিই উদ্দেশ্য, ছাত্র-ছাত্রীদের কল্পনাশক্তি বিকশিত করা এবং লেখার ক্ষমতাকে উৎসাহিত করা।

এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, সাহিত্য সঞ্চয়নের পাশাপাশি দ্রুত পঠনের জন্য একটি পূর্ণাঙ্গ সহায়ক গ্রন্থ এবং নতুন পাঠক্রম অনুযায়ী রচিত একটি ব্যাকরণ গ্রন্থও নবম শ্রেণির শিক্ষার্থীদের পড়তে হবে।

বিভিন্ন শিক্ষাবিদ, শিক্ষক-শিক্ষিকা, বিষয় বিশেষজ্ঞ, সমাজের বিভিন্ন স্তরের শিক্ষাপ্রেমী মানুষ ও অলংকরণের জন্য খ্যাতনামা শিল্পীবৃন্দ—যাঁদের নিরন্তর শ্রম ও নিরলস চেষ্টার ফলে এই গুরুত্বপূর্ণ বইটির নির্মাণ সম্ভব হয়েছে, তাঁদের সকলকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাই।

এই প্রকল্প রূপায়ণে মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী ড. পার্থ চ্যাটার্জী, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বিদ্যালয় শিক্ষাদপ্তর, পশ্চিমবঙ্গ বিদ্যালয় শিক্ষা অধিকার এবং পশ্চিমবঙ্গ সর্বশিক্ষা মিশন নানাভাবে সহায়তা করেন এবং এঁদের ভূমিকাও অনস্বীকার্য।

'সাহিত্য সঞ্চয়ন' বইটির উৎকর্ষ বৃদ্ধির জন্য সকলকে মতামত ও পরামর্শ জানাতে আহ্বান করছি।

ডিসেম্বর, ২০১৭
৭৭/২ পার্ক স্ট্রিট
কলকাতা-৭০০ ০১৬

কল্যাণময় গঙ্গোপাধ্যায়
সভাপতি
পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ

প্রাক্‌কথন

পশ্চিমবঙ্গের মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী শ্রীমতী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ২০১১ সালে বিদ্যালয় শিক্ষার ক্ষেত্রে একটি 'বিশেষজ্ঞ কমিটি' গঠন করেন। এই বিশেষজ্ঞ কমিটির ওপর দায়িত্ব ছিল বিদ্যালয় স্তরের সমস্ত পাঠক্রম, পাঠ্যসূচি এবং পাঠ্যপুস্তকের পর্যালোচনা, পুনর্বিবেচনা এবং পুনর্বিন্যাসের প্রক্রিয়া পরিচালনা করা। সেই কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী নতুন পাঠক্রম, পাঠ্যসূচি এবং পাঠ্যপুস্তক নির্মিত হলো। ইতোপূর্বে প্রাক্-প্রাথমিক থেকে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত সমস্ত পাঠ্যপুস্তক জাতীয় পাঠক্রমের রূপরেখা ২০০৫ এবং শিক্ষার অধিকার আইন ২০০৯ নথিদুটিকে অনুসরণ করে নির্মিত হয়েছে। এবার নবম শ্রেণির নতুন পাঠক্রম, পাঠ্যসূচি অনুযায়ী পাঠ্যপুস্তকগুলি নির্মিত হলো।

নবম শ্রেণির বাংলা প্রথম ভাষার বইয়ের নাম 'সাহিত্য সঞ্চয়ন'। পূর্বতন শ্রেণির পাঠ্যপুস্তকে ব্যবহৃত ভাবমূল (Theme) সমূহ থেকে নির্বাচিত কয়েকটিকে এই বইয়ে ব্যবহার করা হয়েছে। ছয়টি পর্বে বিন্যস্ত এই পাঠ্যপুস্তক সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছে বাংলার অগ্রগণ্য সাহিত্যকারদের রচনায়। অন্যদিকে, অনুবাদের মাধ্যমে পরিবেশিত হয়েছে ভারতীয় সাহিত্য এবং আন্তর্জাতিক সাহিত্য। 'সাহিত্য সঞ্চয়ন' বইয়ের মাধ্যমে আমরা শিক্ষার্থীদের সামনে বাংলা সাহিত্যের বহুবর্ণ, বহুবিচিত্র সম্ভারকে পরিবেশন করতে চেয়েছি। আমরা বিশ্বাস করি, নবম শ্রেণির 'সাহিত্য সঞ্চয়ন' বইটির মাধ্যমে বাংলা ভাষা এবং সাহিত্য সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের গভীর অনুরাগ তৈরি হবে। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, পাঠ্যপুস্তক 'সাহিত্য সঞ্চয়ন'-এর সঙ্গে নতুন পাঠক্রম অনুযায়ী নির্মিত একটি ব্যাকরণ গ্রন্থও শিক্ষার্থীদের পড়া আবশ্যক। পাশাপাশি একটি পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থ দ্রুতপঠন বা সহায়ক পুস্তক হিসেবে পাঠক্রমে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

বইটিকে রঙে-রেখায় অনুপম সৌন্দর্যে চিত্তাকর্ষক করে তুলেছেন বরেণ্য শিল্পী শ্রী সুব্রত গঙ্গোপাধ্যায়। তাঁকে অশেষ কৃতজ্ঞতা জানাই।

নির্বাচিত শিক্ষাবিদ, শিক্ষক-শিক্ষিকা এবং বিষয়-বিশেষজ্ঞবৃন্দ অল্প সময়ের মধ্যে বইটি প্রস্তুত করেছেন। পশ্চিমবঙ্গের মাধ্যমিক শিক্ষার সারস্বত নিয়ামক পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ পাঠ্যপুস্তকটিকে অনুমোদন করে আমাদের বাধিত করেছেন। বিভিন্ন সময়ে পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শিক্ষা দপ্তর, পশ্চিমবঙ্গ সর্বশিক্ষা মিশন, পশ্চিমবঙ্গ শিক্ষা অধিকার প্রভূত সহায়তা প্রদান করেছেন। তাঁদের ধন্যবাদ।

পশ্চিমবঙ্গের মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী ড. পার্থ চ্যাটার্জী প্রয়োজনীয় মতামত এবং পরামর্শ দিয়ে আমাদের বাধিত করেছেন। তাঁকে আমাদের কৃতজ্ঞতা জানাই।

বইটির উৎকর্ষ বৃদ্ধির জন্য শিক্ষাপ্রেমী মানুষের মতামত, পরামর্শ আমরা সাদরে গ্রহণ করব।

অভীক মজুমদার

চেয়ারম্যান
'বিশেষজ্ঞ কমিটি'
বিদ্যালয় শিক্ষা দপ্তর
পশ্চিমবঙ্গ সরকার

ডিসেম্বর, ২০১৭
নিবেদিতা ভবন, ষষ্ঠতল
বিধাননগর, কলকাতা : ৭০০ ০৯১

বিশেষজ্ঞ কমিটি পরিচালিত পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন পর্ষদ

সদস্য

অভীক মজুমদার (চেয়ারম্যান, বিশেষজ্ঞ কমিটি) রথীন্দ্রনাথ দে (সদস্য-সচিব, বিশেষজ্ঞ কমিটি)

নৃসিংহপ্রসাদ ভাদুড়ী

ঋত্বিক মল্লিক সৌম্যসুন্দর মুখোপাধ্যায় রুদ্রশেখর সাহা মিথুন নারায়ণ বসু

অপূর্ব সাহা স্বাতী চক্রবর্তী ইলোরা ঘোষ মির্জা

প্রচ্ছদ ও অলংকরণ

সুব্রত গঙ্গোপাধ্যায়

পুস্তক নির্মাণ

বিপ্লব মণ্ডল

তাপস রায়

সূচিপত্র

প্রথম পাঠ

পৃষ্ঠা ১

- কলিঙ্গদেশে ঝড়-বৃষ্টি — মুকুন্দ চক্রবর্তী
- ধীবর-বৃত্তান্ত — কালিদাস
- ইলিয়াস — লিও তলস্তয়
- সাত ভাই চম্পা — বিষ্ণু দে

দ্বিতীয় পাঠ

পৃষ্ঠা ১২

- দাম — নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়
- এই জীবন — সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়
- নব নব সৃষ্টি — সৈয়দ মুজতবা আলী
- নূতন জীবন — হিরণ্ময়ী দেবী
- ঝোড়ো সাধু — মহাশ্বেতা দেবী

তৃতীয় পাঠ

পৃষ্ঠা ২৭

- পথে প্রবাসে — অন্নদাশঙ্কর রায়
- ঘর — অমিয় চক্রবর্তী
- হিমালয় দর্শন — বেগম রোকেয়া
- নোঙর — অজিত দত্ত

চতুর্থ পাঠ

পৃষ্ঠা ৩৬

পালামৌ
সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

* খেয়া
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

* আকাশে সাতটি তারা
জীবনানন্দ দাশ

বর্ষা
প্রমথ চৌধুরী

* আবহমান
নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

পঞ্চম পাঠ

পৃষ্ঠা ৪৬

উপোস
বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়

* ভাঙার গান
কাজী নজরুল ইসলাম

* চিঠি
স্বামী বিবেকানন্দ

* আমরা
সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত

ষষ্ঠ পাঠ

পৃষ্ঠা ৬০

* নিরুদ্দেশ
প্রেমেন্দ্র মিত্র

ব্যথার বাঁশি
জসীমউদ্দীন

ছুটি
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

জন্মভূমি আজ
বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

* রাধারাণী
বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

এই তার পরিচয়
কবিতা সিংহ

* চন্দ্রনাথ
তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

লেখক পরিচিতি

পৃষ্ঠা ৮৭

শিখন পরামর্শ

পৃষ্ঠা ৯৩

[*] চিহ্নিত পাঠগুলি পাঠ্যসূচির অন্তর্ভুক্ত

কলিঙ্গদেশে ঝড়-বৃষ্টি

মুকুন্দ চক্রবর্তী

মেঘে কৈল অন্ধকার মেঘে কৈল অন্ধকার।
দেখিতে না পায় কেহ অঙ্গ আপনার।।
ঈশানে উড়িল মেঘ সঘনে চিকুর।
উত্তর পবনে মেঘ ডাকে দুর দুর।।
নিমিষেকে জোড়ে মেঘ গগন-মণ্ডল।
চারি মেঘে বরিষে মুষলধারে জল।।
কলিঙ্গে উড়িয়া মেঘ ডাকে উচ্চনাদ।
প্রলয় গণিয়া প্রজা ভাবয়ে বিষাদ।
হুড় হুড় দুড় দুড় বহে ঘন ঝড়।
বিপাকে ভবন ছাড়ি প্রজা দিল রড়।।

ধূলে আচ্ছাদিত হইল যে ছিল হরিত।
উলটিয়া পড়ে শস্য প্রজা চমকিত।।
চারি মেঘে জল দেয় অষ্ট গজরাজ।
সঘনে চিকুর পড়ে বেঙ্গ-তড়কা বাজ।।
করি-কর সমান বরিষে জলধারা।
জলে মহী একাকার পথ হইল হারা।।
ঘন ঘন শুনি চারি মেঘের গর্জন।
কারো কথা শুনিতে না পায় কোনো জন।।
পরিচ্ছিন্ন নাহি সন্ধ্যা দিবস রজনী।
কলিঙ্গে সোঙরে সকল লোক যে জৈমিনি।।
হুড় হুড় দুড় দুড় শুনি ঝন ঝন।
না পায় দেখিতে কেহ রবির কিরণ।।
গর্ত ছাড়ি ভুজঙ্গ ভাসিয়া বুলে জলে।
নাহি জানি জলস্থল কলিঙ্গ-মণ্ডলে।।
নিরবধি সাত দিন বৃষ্টি নিরন্তর।
আছুক শস্যের কার্য হেজ্যা গেল ঘর।।
মেঝ্যাতে পড়য়ে শিল বিদারিয়া চাল।
ভাদ্রপদ মাসে যেন পড়ে থাকা তাল।।
চণ্ডীর আদেশ পান বীর হনুমান।
মঠ অট্টালিকা ভাঙ্গি করে খান খান।।
চারিদিকে বহে ঢেউ পর্বত-বিশাল।
উঠে পড়ে ঘরগুলা করে দলমল।।
চণ্ডীর আদেশে ধায় নদনদীগণ।
অম্বিকামঙ্গল গান শ্রীকবিকঙ্কণ।।

(নির্বাচিত অংশ)

ধীবর-বৃত্তান্ত

কালিদাস

মহর্ষি কণ্বের তপোবনে তাঁর অনুপস্থিতিতে শকুন্তলাকে বিয়ে করে রাজা দুষ্মন্ত রাজধানীতে ফিরে গেছেন। কিন্তু দীর্ঘ সময় পরেও শকুন্তলার খোঁজ নিতে কোনো দূত তপোবনে এল না। স্বামীর চিন্তায় যখন শকুন্তলা অন্যমনা তখন তপোবনে এলেন ঋষি দুর্বাসা। শকুন্তলা তা টের না পাওয়ায় ঋষি অপমানিত বোধ করলেন এবং অভিশাপ দিলেন, যাঁর চিন্তায় সে মগ্ন, সেই ব্যক্তি শকুন্তলাকে ভুলে যাবেন। শেষপর্যন্ত সখী প্রিয়ংবদার অনুরোধে ঋষি বললেন যে, কোনো নিদর্শন দেখাতে পারলে তবে শাপের প্রভাব দূর হবে।

দুষ্মন্ত রাজধানীর উদ্দেশে বিদায় গ্রহণের সময় শকুন্তলাকে যে আংটি পরিয়ে দিয়েছিলেন, সখীরা মনে করলেন সেই আংটিই হবে ভবিষ্যতের স্মারকচিহ্ন।

মহর্ষি কণ্ব তীর্থ থেকে ফিরে শকুন্তলাকে পতিগৃহে পাঠানোর আয়োজন করলেন। দুষ্মন্ত-সমীপে উপস্থিত হলে তিনি শকুন্তলাকে চিনতেও পারলেন না। এদিকে পথে শচীতীর্থে স্নানের পর অঞ্জলি দেওয়ার সময় হাত থেকে খুলে পড়ে গেছে শকুন্তলার হাতের আংটি। শকুন্তলা অপমানিতা হলেন রাজসভায়।

ঘটনাক্রমে সেই আংটি পেল এক ধীবর...

(তারপর নগর-রক্ষায় নিযুক্ত রাজ-শ্যালক এবং পিছনে হাতবাঁধা অবস্থায় এক পুরুষকে সঙ্গে নিয়ে দুই রক্ষীর প্রবেশ।)

দুই রক্ষী—(তাড়না করে) ওরে ব্যাটা চোর, বল্—মণিখচিত, রাজার নাম খোদাই করা এই (রাজার) আংটি তুই কোথায় পেলি?

পুরুষ—(ভয় পাওয়ার অভিনয় করে) আপনারা শান্ত হন। আমি এরকম কাজ (অর্থাৎ চুরি) করিনি।

প্রথম রক্ষী—তবে কি তোকে সদ্ ব্রাহ্মণ বিবেচনা করে রাজা এটা দান করেছেন?

পুরুষ—আপনারা অনুগ্রহ করে শুনুন। আমি একজন জেলে, শক্রাবতারে আমি থাকি।

দ্বিতীয় রক্ষী—ব্যাটা বাটপাড়, আমরা কি তোর জাতির কথা জিজ্ঞাসা করেছি?

শ্যালক—সূচক, একে পূর্বাপর সব বলতে দাও। মধ্যে বাধা দিয়ো না।

দুই রক্ষী—তা আপনি যা আদেশ করেন। বল্, কী বলছিলি।

পুরুষ—আমি জাল, বড়শি ইত্যাদি নানা উপায়ে মাছ ধরে সংসার চালাই।

শ্যালক—(হেসে) তা তোর জীবিকা বেশ পবিত্র বলতে হয় দেখছি।

পুরুষ—শুনুন মহাশয়, এরকম বলবেন না।

যে বৃত্তি নিয়ে যে মানুষ জন্মেছে, সেই বৃত্তি নিন্দনীয় (ঘৃণ্য) হলেও তা পরিত্যাগ করা উচিত নয়। বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ স্বভাবে দয়াপরায়ণ হলেও যজ্ঞীয় পশুবধের সময় নির্দয় হয়ে থাকেন।

শ্যালক—তারপর, তারপর?

পুরুষ—একদিন একটা রুই মাছ যখন আমি খণ্ড খণ্ড করে কাটলাম, তখন সেই মাছের পেটের মধ্যে মণিমুক্তায় ঝলমলে এই আংটিটা দেখতে পেলাম। পরে সেই আংটিটা বিক্রি করার জন্য যখন লোককে দেখাচ্ছিলাম তখন আপনারা আমায় ধরলেন। এখন মারতে হয় মারুন, ছেড়ে দিতে হয় ছেড়ে দিন। কীভাবে এই আংটি আমার কাছে এল—তা বললাম।

শ্যালক—জানুক, এর গা থেকে কাঁচা মাংসের গন্ধ আসছে। এ অবশ্যই গোসাপ-খাওয়া জেলে হবে। তবে আংটি পাবার ব্যাপারে যা বলল তা একবার অনুসন্ধান করে দেখতে হবে। সুতরাং রাজবাড়িতেই যাই।

দুই রক্ষী—তবে তাই হোক। চল রে গাঁটকাটা!

(সবাই এগিয়ে চললেন)

শ্যালক—সূচক, সদর দরজায় সাবধানে এই চোরকে নিয়ে অপেক্ষা কর। ইতিমধ্যে এই আংটি কীভাবে পাওয়া গেল সে-সব বিষয় মহারাজকে নিবেদন করে তাঁর আদেশ নিয়ে ফিরছি।

দুই রক্ষী—আপনি প্রবেশ করুন! মহারাজ এ সংবাদ শুনে খুব খুশি হবেন।

(রাজশ্যালক বেরিয়ে গেলেন)

প্রথম রক্ষী—আমাদের প্রভুর দেখি খুব বিলম্ব হচ্ছে।

দ্বিতীয় রক্ষী—আরে বাবা, অবসর বুঝে তবে না রাজার কাছে যাওয়া যায়।

প্রথম রক্ষী—জানুক, একে মারার আগে (এর গলায় যে) ফুলের মালা পরানো হবে, তা গাঁথতে আমার হাত দুটো (এখনই) নিশপিশ করছে। (জেলেকে দেখিয়ে দিল)

পুরুষ (জেলে)—মহাশয়, বিনা দোষে আমাকে মারবেন না।

দ্বিতীয় রক্ষী—(তাকিয়ে দেখে) এই তো আমাদের প্রভু, মহারাজের হুকুমনামা হাতে নিয়ে এদিকে আসছেন। হয় তোকে শকুনি দিয়ে খাওয়ানো হবে, না হয় কুকুর দিয়ে খাওয়ানো হবে।

(রাজশ্যালক প্রবেশ করে)

শ্যালক—সূচক, এই জেলেকে ছেড়ে দাও। আংটি পাওয়ার ব্যাপারে এ যা বলেছে তা সব সত্যি বলে প্রমাণিত হয়েছে।

সূচক—তা প্রভু যা আদেশ করেন।

দ্বিতীয় রক্ষী—এই জেলে যমের বাড়ি গিয়ে আবার ফিরে এল। (জেলের হাতের বাঁধন খুলে দিল)

পুরুষ—(শ্যালককে প্রণাম করে) প্রভু, আজ আমার সংসার চলবে কীভাবে?

শ্যালক—মহারাজ আংটির মূল্যের সমান পরিমাণ এই অর্থ খুশি হয়ে তোমায় দিয়েছেন। (জেলেকে টাকা দিলেন)

পুরুষ—(প্রণাম করে গ্রহণ করে) প্রভু, অনুগৃহীত হলাম।

সূচক—এ কি যা-তা অনুগ্রহ! এ যে শূল থেকে নামিয়ে একেবারে হাতির পিঠে চড়িয়ে দেওয়া হলো।

জানুক—হুজুর, যে পরিমাণ পারিতোষিক দেখছি—তাতেই বোঝা যাচ্ছে সেই আংটিটা রাজার (খুব) প্রিয় ছিল।

শ্যালক—দামি রত্ন বসানো বলেই আংটিটা রাজার কাছে মূল্যবান মনে হয়েছে—এমনটা আমার মনে হয় না। সেই আংটি দেখে মহারাজের কোনো প্রিয়জনের কথা মনে পড়েছে। স্বভাবত গম্ভীর প্রকৃতির হলেও মুহূর্তের জন্য রাজা বিহ্বলভাবে চেয়ে রইলেন।

সূচক— তাহলে আপনি মহারাজের একটা সেবা করলেন বলতে হয়।

জানুক— তার চেয়ে বল— এই জেলের সেবা করলেন। (জেলেকে হিংসায় ভরা দৃষ্টিতে দেখলেন)

পুরুষ (জেলে)—মহাশয়, এই পারিতোষিকের অর্ধেক আপনাদের ফুলের দাম হিসাবে দিচ্ছি।

জানুক—এটা তুমি ঠিকই বলেছ।

শ্যালক—শোনো ধীবর, এখন থেকে তুমি আমার একজন বিশিষ্ট প্রিয় বন্ধু হলে।

(সংক্ষেপিত ও সম্পাদিত)

তরজমা : সত্যনারায়ণ চক্রবর্তী

ইলিয়াস

লিও তলস্তয়

উফা প্রদেশে ইলিয়াস নামে একজন বাস্‌কির বাস করত।

ইলিয়াসের বিয়ের এক বছর পরে যখন তার বাবা মারা গেল তখন সে না ধনী, না দরিদ্র। সাতটা ঘোটকী, দুটো গোরু আর কুড়িটা ভেড়া—এই তার যা কিছু বিষয়-সম্পত্তি। কিন্তু ইলিয়াসের সুব্যবস্থায় তার সম্পত্তি কিছু কিছু করে বাড়তে লাগল। সে আর তার স্ত্রী সকলের আগে ঘুম থেকে ওঠে আর সকলের পরে ঘুমোতে যায়। সকাল থেকে রাত পর্যন্ত কাজ করে। ফলে প্রতি বছরই তার অবস্থার উন্নতি হতে লাগল।

এইভাবে পঁয়ত্রিশ বছর পরিশ্রম করে সে প্রচুর সম্পত্তি করে ফেলল। তখন তার দুশো ঘোড়া, দেড়শো গোরু-মোষ, আর বারোশো ভেড়া। ভাড়াটে মজুররা তার গোরু-ঘোড়ার দেখাশোনা করে, ভাড়াটে মজুরানিরা দুধ দোয়, কুমিস, মাখন আর পনির তৈরি করে। মোট কথা, ইলিয়াসের তখন খুব বোলবোলাও, পাশেপাশের সকলেই তাকে ঈর্ষা করে। বলে: 'ইলিয়াস তো ভাগ্যবান পুরুষ; কোনো কিছুরই অভাব নেই; ওর তো মরবারই দরকার নেই।'

ক্রমে ভালো ভালো লোকের সঙ্গে তার পরিচয় হতে লাগল। দূর দূরান্তর থেকে অতিথিরা তার সঙ্গে দেখা করতে আসে। সকলকেই স্বাগত জানিয়ে সে তাদের ভোজ্য পানীয় দিয়ে সেবা করে। যে যখনই আসুক, কুমিস, চা, শরবত আর মাংস সব সময়েই হাজির। অতিথি এলেই একটা বা দুটো ভেড়া মারা হয়; সংখ্যায় বেশি হলে ঘোটকীও মারা হয়।

ইলিয়াসের দুই ছেলে, এক মেয়ে। সকলেরই বিয়ে হয়ে গেছে। ইলিয়াস যখন গরিব ছিল, ছেলেরা তার সঙ্গে কাজ করত, গোরু-ভেড়া চরাত। কিন্তু বড়োলোক হওয়ার পরে তারা আয়েশি হয়ে উঠল। বড়োটি এক মারামারিতে পড়ে মারা গেল। ছোটোটি এমন এক ঝগড়াটে বউ বিয়ে করল যে তারা বাপের আদেশই অমান্য করতে শুরু করল। ফলে ইলিয়াসের বাড়ি থেকে তাদের তাড়িয়ে দেওয়া হলো।

ইলিয়াস তাকে একটা বাড়ি দিল, কিছু গোরু-ঘোড়াও দিল। ফলে ইলিয়াসের সম্পত্তিতে টান পড়ল। তারপরেই ইলিয়াসের ভেড়ার পালে মড়ক লেগে অনেকগুলো মরে গেল। তার পরের বছর দেখা দিল দুর্ভিক্ষ। খড় পাওয়া গেল না একেবারে। ফলে সে-বছর শীতকালে অনেক গোরু-মোষ না খেয়ে মরল। তারপর 'কিরবিজ'রা তার সবচাইতে ভালো ঘোড়াগুলো চুরি করে নিয়ে গেল। ইলিয়াসের অবস্থা খারাপ হয়ে পড়ল। যত তার অবস্থা পড়তে লাগল ততই তার শরীরের জোরও কমতে লাগল। এমনি করে সত্তর বছর বয়সে ইলিয়াস বাধ্য হয়ে তার পশমের কোট, কম্বল, ঘোড়ার জিন, তাঁবু এবং সবশেষে গৃহপালিত পশুগুলোকে বিক্রি করে দিয়ে দুর্দশার একেবারে চরমে নেমে গেল। আসল অবস্থা বুঝে উঠবার আগেই সে একেবারে সর্বহারা হয়ে পড়ল। ফলে বৃদ্ধ বয়সে স্বামী-স্ত্রীকে অজানা লোকের বাড়িতে বাস করে, তাদের কাজ করে খেতে হতো। সম্বলের মধ্যে রইল শুধু কাঁধে একটা বোঁচকা—তাতে ছিল একটা লোমের তৈরি কোট, টুপি, জুতো আর বুট, আর তার বৃদ্ধা স্ত্রী শাম-শেমাগি। বিতাড়িত পুত্র অনেক দূর দেশে চলে গেছে, মেয়েটিও মারা গেছে। বৃদ্ধ দম্পতিকে সাহায্য করবার তখন কেউ নেই!

মহম্মদ শা নামে এক প্রতিবেশীর করুণা হলো বুড়ো-বুড়ির জন্য। সে নিজে ধনীও নয়, গরিবও নয়, তবে থাকত সুখে, আর লোকও ভালো। ইলিয়াসের অতিথি-বৎসলতার কথা স্মরণ করে তার খুব দুঃখ হলো। বলল :

'ইলিয়াস, তুমি আমার বাড়ি এসে আমার সঙ্গে থাকো। বুড়িকেও নিয়ে এসো। যতটা ক্ষমতায় কুলোয় গ্রীষ্মে আমার তরমুজের ক্ষেতে কাজ করবে আর শীতকালে গোরু-ঘোড়াগুলোকে খাওয়াবে। শাম-শেমাগিও ঘোটকীগুলোকে দুইতে পারবে, কুমিস তৈরি করতে পারবে। আমি তোমাদের দুজনেরই খাওয়া-পরা দেবো। এছাড়া যদি কখনও কিছু লাগে, বলবে, তাও দেবো।

ইলিয়াস প্রতিবেশীকে ধন্যবাদ দিল। সে আর তার স্ত্রী মহম্মদ শার বাড়িতে ভাড়াটে মজুরের মতো কাজ করে খেতে লাগল। প্রথমে বেশ কষ্ট হতো, কিন্তু ক্রমে ক্রমে সব সয়ে গেল। যতটা পারত কাজ করত আর থাকত।

বুড়ো-বুড়িকে রেখে মহম্মদ শারও লাভ হলো, কারণ নিজেরা একদিন মনিব ছিল বলে সব কাজই তারা ভালোভাবে করতে পারত। তা ছাড়া তারা অলস নয়, সাধ্যমতো কাজকর্ম করত। তবু এই সম্পন্ন মানুষ দুটির দুরবস্থা দেখে মহম্মদ শার দুঃখ হতো।

একদিন মহম্মদ শার একদল আত্মীয় অনেক দূর থেকে এসে তার বাড়িতে অতিথি হলো। তাদের মধ্যে একজন ছিলেন মোল্লা। মহম্মদ শা ইলিয়াসকে একটা ভেড়া এনে মারতে বলল। ইলিয়াস তার চামড়া ছাড়িয়ে, সেদ্ধ করে অতিথিদের কাছে পাঠিয়ে দিল। অতিথিরা খাওয়া-দাওয়া করল, চা খেল, তারপর কুমিস-এ হাত

দিল। মেঝেয় কম্বলের উপরে পাতা কুশনে গৃহস্বামীর সঙ্গে বসে অতিথিরা বাটি থেকে কুমিস পান করতে করতে গল্প করছিল। এমন সময় কাজ শেষ করে ইলিয়াস দরজার পাশ দিয়ে যাচ্ছিল। তাকে দেখতে পেয়ে মহম্মদ শা অতিথিদের বলল :

'দরজার পাশ দিয়ে যে বুড়ো মানুষটি চলে গেল তাকে আপনারা লক্ষ করেছেন কি?'

একজন বলল, 'আমি তাকে দেখিনি। কিন্তু ওর মধ্যে বিশেষ করে দেখবার কিছু আছে নাকি?'

'বিশেষত্ব এই যে, একসময় সে এ তল্লাটের সবচেয়ে ধনী ছিল। নাম ইলিয়াস। নামটা আপনারা হয়তো শুনে থাকবেন।'

অতিথি বলল, 'নিশ্চয়ই। না শোনবার জো কী? লোকটিকে কখনও চোখে দেখিনি, কিন্তু তার সুনাম ছড়িয়েছিল বহুদূর।'

'অথচ আজ তার কিছু নেই। আমার কাছে মজুরের মতো থাকে, আর তার স্ত্রী আমার ঘোটকীদের দুধ দোয়।'

অতিথি সবিস্ময়ে জিভ দিয়ে চুক্-চুক্ শব্দ করল। ঘাড় নাড়তে নাড়তে বলল, 'সত্যি, ভাগ্য যেন চাকার মতো ঘোরে; একজন উপরে ওঠে তো আর একজন তলায় পড়ে যায়। আহা, বলুন তো, বুড়ো লোকটা এখন নিশ্চয়ই খুব বিষণ্ণ?'

'কী জানি, খুব চুপচাপ আর শান্ত হয়ে থাকে। কাজও করে ভালো।'

অতিথি বলল, 'লোকটির সঙ্গে একটু কথা বলতে পারি কি? জীবন সম্পর্কে ওকে কিছু জিজ্ঞাসা করতে চাই আমি।'

গৃহস্বামী বলল, 'নিশ্চয়ই পারেন।' তারপর তাঁবুর বাইরে গিয়ে ডাকল : 'বাবাই, একবার এদিকে এসো তো। তোমার বুড়িকেও সঙ্গে নিয়ে এসো। আমাদের সঙ্গে একটু কুমিস পান করবে।'

ইলিয়াস আর তার স্ত্রী এল। ইলিয়াস অতিথি ও গৃহস্বামীকে নমস্কার করল, প্রার্থনা করল, তারপর দরজার পাশে এক কোণে বসল। তার স্ত্রী পর্দার আড়ালে গিয়ে কর্ত্রীর পাশে বসল।

ইলিয়াসকে এক বাটি কুমিস দেওয়া হলো। সে আবার অতিথি ও গৃহস্বামীকে মাথা নীচু করে নমস্কার করল এবং একটু খেয়ে বাকিটা নামিয়ে রাখল।

অতিথি তাকে জিজ্ঞাসা করল, 'আচ্ছা বাবাই, আমাদের দেখে তোমার অতীত জীবনের সুখ-সমৃদ্ধির কথা স্মরণ করে এবং এখনকার দুরবস্থার কথা ভেবে কি খুব কষ্ট হচ্ছে?'

ইলিয়াস হেসে বলল, 'সুখ-দুঃখের কথা যদি বলি, আপনারা হয়তো আমার কথা বিশ্বাস করবেন না। বরং আমার স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করুন। তিনি মেয়েমানুষ, তাঁর মনেও যা মুখেও তাই। এ বিষয়ে তিনিই পুরো সত্য বলতে পারবেন।'

অতিথি তখন পর্দার দিকে তাকিয়ে বলল, 'আচ্ছা ঠাক্মা, আগেকার সুখ আর এখনকার দুঃখ সম্পর্কে তোমার মনের কথাটা বলো তো!'

পর্দার আড়াল থেকে শাম-শেমাগি বলতে লাগল : 'এই হলো আমার মনের কথা : পঞ্চাশ বছর এই বুড়ো আর আমি একত্র বাস করেছি, সুখ খুঁজেছি; কিন্তু কখনও পাইনি। আর আজ এখানে এই আমাদের দ্বিতীয় বছর,

যখন আমাদের কিছুই নেই, যখন আমরা ভাড়াটে মানুষের মতো বেঁচে আছি, তখন আমরা পেয়েছি সত্যিকারের সুখ; আজ আর কিছুই চাই না।'

অতিথিরা বিস্মিত। গৃহস্বামীও বিস্মিত। সে উঠে দাঁড়াল। পর্দা সরিয়ে বুড়ির দিকে তাকাল। দুই হাত ভেঙে বসে সে স্বামীর দিকে চেয়ে হাসছে। স্বামীও হাসছে।

বুড়ি আবার কথা বলল: 'আমি সত্য কথাই বলছি, তামাশা করছি না। অর্ধ-শতাব্দী ধরে আমরা সুখ খুঁজেছি; যতদিন ধনী ছিলাম, কখনও সুখ পাইনি। কিন্তু আজ এমন সুখের সন্ধান আমরা পেয়েছি যে আর কিছুই আমরা চাই না।'

'কিন্তু এখন কীসে তোমাদের সুখ হচ্ছে?'

'বলছি। যখন ধনী ছিলাম, বুড়োর বা আমার এক মুহূর্তের জন্যও শান্তি ছিল না,—কথা বলবার সময় নেই। অন্তরের কথা ভাববার সময় নেই, ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করবার সময় নেই। দুশ্চিন্তারও অন্ত ছিল না। হয়তো অতিথিরা এলেন—এক দুশ্চিন্তা : কাকে কী খেতে দিই, কী উপহার দিই যাতে লোকে নিন্দা না করে। আবার অতিথিরা চলে গেলে মজুরদের দিকে নজর দিতে হয়; তারা যেমন কম খেটে বেশি খেতেই ব্যস্ত, তেমনি আমরাও নিজেদের স্বার্থে তাদের উপর কড়া নজর রাখি,—সেও তো পাপ। অন্যদিকে দুশ্চিন্তা—এই বুঝি নেকড়েতে ঘোড়ার বাচ্চা বা গোরুর বাছুরটা নিয়ে গেল। কিংবা চোর এসে ঘোড়াগুলোই নিয়ে সরে পড়ল। রাতে ঘুমোতে গেলাম, কিন্তু ঘুমোবার উপায় নেই, মনে দুশ্চিন্তা —ভেড়ি বুঝি ছানাগুলোকে চেপে মেরে ফেলল। ফলে সারারাত ঘুমই ছিল না। একটা দুশ্চিন্তা পেরোতেই আর একটা এসে মাথা চাড়া দিত,—শীতের জন্য যথেষ্ট খড় মজুত আছে তো! এছাড়া বুড়োর সঙ্গে মতবিরোধ ছিল; সে হয়তো বলল এটা এভাবে করা হোক, আমি বললাম অন্যরকম। ফলে ঝগড়া। সেও তো পাপ। কাজেই এক দুশ্চিন্তা থেকে আর এক দুশ্চিন্তায়, এক পাপ থেকে আর এক পাপেই দিন কাটত, সুখী জীবন কাকে বলে কোনোদিন বুঝিনি।'

'আর এখন?'

'এখন বুড়ো আর আমি একসঙ্গে সকালে উঠি, দুটো সুখ-শান্তির কথা বলি। ঝগড়াও কিছু নেই, দুশ্চিন্তাও কিছু নেই,—আমাদের একমাত্র কাজ প্রভুর সেবা করা। যতটা খাটতে পারি স্বেচ্ছায়ই খাটি, কাজেই প্রভুর কাজে আমাদের লাভ বই লোকসান নেই। বাড়িতে এলেই খাবার ও কুমিস পাই। শীতকালে গরম হবার জন্য লোমের কোট আছে, জ্বালানি আছে। আত্মার কথা আলোচনা করবার বা ভাববার মতো সময় আছে, সময় আছে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করবার। পঞ্চাশ বছর ধরে সুখ খুঁজে খুঁজে এতদিনে পেয়েছি।'

অতিথিরা হেসে উঠল। কিন্তু ইলিয়াস বলল, 'বন্ধুগণ হাসবেন না। এটা তামাশা নয়। এটাই মানুষের জীবন, আমার স্ত্রী আর আমি অবুঝ ছিলাম, তাই সম্পত্তি হারিয়ে কেঁদেছিলাম। কিন্তু ঈশ্বর আমাদের কাছে সত্যকে উন্মুক্ত করেছেন। আর সে কথা যে আমরা আপনাদের বললাম তা ফুর্তির জন্য নয়, আপনাদের কল্যাণের জন্য।'

তখন মোল্লা বললেন :

'এটা খুবই জ্ঞানের কথা। ইলিয়াস যা বলল সবই সত্য এবং পবিত্র গ্রন্থে লেখা আছে।'

শুনে অতিথিরা ভাবতে বসল।

(সম্পাদিত)

তরজমা : মণীন্দ্র দত্ত

সাত ভাই চম্পা

বিষ্ণু দে

চম্পা! তোমার মায়ার অন্ত নেই,
কত-না পারুল-রাঙানো রাজকুমার
কত সমুদ্র কত নদী হয় পার!
বিরাট বাংলা দেশের কত-না ছেলে
অবহেলে সয় সকল যন্ত্রণাই–
চম্পা কখন জাগবে নয়ন মেলে।

চম্পা, তোমার প্রেমেই বাংলা দেশ
কত-না শাঙন রজনী পোহাল বলো।
গৌরীশৃঙ্গ মাথা হেঁট টলোমলো,
নিষিদ্ধ দেশে দীপঙ্করের শিখা
চিনে জ্বলে, হয় মঙ্গোলিয়ায় লেখা,
চম্পা, তোমায় চিনেছিল সিংহলও।

তোমাকে খুঁজেছে জানো কি কৃষকে নৃপে
অশ্বের খুরে, লাঙলের ফলা টেনে,
হাতুড়ির ঘায়ে, কাস্তের বাঁকা শানে,
ভাটিয়ালি গানে, কপিলমুনির দ্বীপে;
কলিঙ্গে আর কঙ্কণে গুর্জরে
চম্পা, তোমার সাত ভাই গান করে।

শ্যাম-কাম্বোজে তারা বুঝি টানে দাঁড়,
নীল-কমলের দেশে রেখে আসে হাড়
বহু চাঁদ বহু শ্রীমন্ত সদাগর,
চম্পা, তোমারই পারুল মায়ার লোভে
বাহিরকে ঘর আপনকে করে পর,
বলী হাসে, আসে যবদ্বীপের সাড়।

তোমার বাহুর নির্দেশ দেখে ক্ষোভে
কত প্রাণ গেল, কতজনা নিশি ডেকে
অন্ধ আবেগে বৈতরণীতে ডোবে।
চম্পা, তোমার অবিনশ্বর প্রাণ
এ কোন হিরণমায়ায় রেখেছ ঢেকে,
খুলে দাও মুখ, রৌদ্রে জ্বলুক গান।

কড়ির পাহাড়ে চম্পা, তুমি তো নেই;
কাঞ্চনমালা জানে না তোমার খেই;
তবুও তোমায় খুঁজে মরে সারা দেশ–
ঘোচাও চম্পা, দুস্থ ছদ্মবেশ,
এ মাহ ভাদরে ভরা বাদরের শেষে
চকিতে দেখাও জনগণমনে মুখ–
মুক্তি! মুক্তি! চিনি সে তীব্র সুখ,
সাত ভাই জাগে, নন্দিত দেশ-দেশ।।

দাম

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

স্কুলে কী বিভীষিকাই যে ছিলেন ভদ্রলোক!

আমাদের অঙ্ক কষাতেন। আশ্চর্য পরিষ্কার ছিল মাথা। যেসব জটিল অঙ্ক নিয়ে আমরা ঘণ্টার পর ঘণ্টা পণ্ডশ্রম করেছি, একবার মাত্র তাকিয়ে দেখতেন তার দিকে, তারপরেই এগিয়ে যেতেন ব্ল্যাক বোর্ডে, খস্‌খস্ করে ঝড়ের গতিতে এগিয়ে চলতো খড়ি। হঠাৎ খড়ি ভেঙে গেলে বিরক্ত হয়ে টুকরো দুটো আমাদের দিকে ছুঁড়ে দিয়ে তৎক্ষণাৎ আর একটা তুলে নিতেন, একটু পরেই আমরা রোমাঞ্চিত হয়ে দেখতুম—ছবির মতো অঙ্কটা সাজিয়ে দিয়েছেন।

পৃথিবীতে যত অঙ্ক ছিল, সব যেন ওঁর মুখস্থ। কিংবা মুখস্থ বললেও ঠিক হয় না, মনে হতো, আমাদের অদৃশ্য অক্ষরে বোর্ডে আগে থেকেই কষা রয়েছে, অথচ উনি দেখতে পাচ্ছেন ঠিক, আর সঙ্গে সঙ্গে তার উপরে খড়ি বুলিয়ে চলেছেন।

অঙ্কে যারা একশোর মধ্যে একশো পায়, ওঁর ভয়ে তারাই তটস্থ হয়ে থাকত। আর আমাদের মতো যেসব অঙ্ক-বিশারদের টেনেটুনে কুড়িও উঠতে চাইত না, তাদের অবস্থা সহজেই কল্পনা করা যেতে পারে। প্রকাণ্ড হাতের প্রচণ্ড চড় খেয়ে মাথা ঘুরে যেত, কিন্তু কাঁদবার জো ছিল না। চোখে এক ফোঁটা জল দেখলেই ক্লাস ফাটিয়ে হুঙ্কার ছাড়তেন: পুরুষ মানুষ হয়ে অঙ্ক পারিসনে—তার উপরে কাঁদতে লজ্জা করে না? এখনি পা ধরে স্কুলের পুকুরে ছুঁড়ে ফেলে দেবো।

তা উনি পারতেন। ওঁর চড়ের জোর থেকেই আমরা তা আন্দাজ করে নিয়েছিলুম।

পুরুষমানুষ হয়ে অঙ্ক পারে না—এমন অঘটন কল্পনাও করতে পারতেন না মাস্টার মশাই। বলতেন, প্লেটোর দোরগোড়ায় কী লেখা ছিল, জানিস? যে অঙ্ক জানে না—এখানে তার প্রবেশ নিষেধ। স্বর্গের দরজাতেও ঠিক ওই কথাই লেখা রয়েছে—যদি সেখানে যেতে চাস, তা হলে—

স্বর্গের খবরটা মাস্টারমশাই কোত্থেকে যোগাড় করলেন তিনিই জানেন। প্লেটো কে, তাঁর দরজা দিয়ে ঢুকতে না পারলে কী ক্ষতি হবে, এ নিয়ে আমরা কোনোদিন মাথা ঘামাইনি। তাছাড়া যে স্বর্গে পা দিয়েই জ্যামিতির এক্সট্রা কষতে হবে কিংবা স্কোয়ার মেজারের অঙ্ক নিয়ে বসতে হবে, সে স্বর্গের চাইতে লক্ষ যোজন দূরে থাকাই আমরা নিরাপদ বোধ করতুম।

ম্যাট্রিকুলেশনের গণ্ডী পার হয়ে অঙ্কের হাত থেকে রেহাই পেলুম, মাস্টারমশাইয়ের হাত থেকেও। কিন্তু অঙ্কের সেই বিভীষিকা মন থেকে গেল না। এম-এ পাশ করবার পরেও স্বপ্ন দেখেছি, পরীক্ষার লাস্ট বেল পড়ো-পড়ো, অথচ একটা অঙ্কও আমার মিলছে না। মাস্টারমশাই গার্ড হয়ে একবার আমার সামনে এসে দাঁড়িয়েছেন, দু-চোখ দিয়ে তাঁর আগুন ঝরছে। দাঁতে দাঁতে ঘষে বলছেন—

মাথার উপর ঘুরন্ত পাখা সত্ত্বেও ঘামে নেয়ে আমি জেগে উঠেছি। মৃদু নীল আলোয় দেখেছি চেনা ঘরটাকে, চোখে পড়েছে সামনে আমার পড়ার টেবিল, আমার বইপত্রের স্তূপ। গভীর তৃপ্তির সঙ্গে ভেবেছি, এখন আর আমাকে স্কুলে অঙ্ক কষতে হয় না, আমি কলেজে বাংলা পড়াই।

একদিন একটি পত্রিকার পক্ষ থেকে ফরমাশ এল, আমার ছেলেবেলার গল্প শোনাতে হবে। আমি জানালুম, লেখক হিসেবে আমি নিতান্ত সামান্য ব্যক্তি, আমার ছেলেবেলার গল্পে কারো কোনো কৌতূহল নেই। তাছাড়া এমন কোনো স্মরণীয় ঘটনা ঘটেনি যে আসর করে তা লোককে শোনাতে পারি। কিন্তু কর্তৃপক্ষ ছাড়লেন না, তাঁরা জানালেন, সাহিত্যের ইন্দ্র চন্দ্র মিত্র বরুণেরা কেউ তাঁদের বিশেষ পাত্তা দেননি, অতএব—

অতএব আমি ভাবলুম, তা হলে নির্ভয়ে লিখতে পারি। ওঁরা নিজেরা ছাড়া ওঁদের কাগজের বিশেষ পাঠক নেই, সুতরাং আমার আত্মকথা কারো কাছে স্পর্ধার মতো মনে হবে না। কয়েকটি ঘরোয়া মানুষের কাছে ঘরোয়া গল্প বলব—ওটা প্রীতির ব্যাপার, পদমর্যাদার নয়। কাগজ কলম নিয়ে বসে গেলুম।

মনে এল মাস্টারমশাইয়ের কথা। লিখলুম তাঁকে নিয়েই।

ছবিটা যা ফুটল, তা খুব উজ্জ্বল নয়। লেখবার সময় কল্পনার খাদ কিছু মিশিয়ে নিলুম সেটা বলাই বাহুল্য। সেই সঙ্গে সদুপদেশও একটু বর্ষণ করেছিলুম। মূল কথাটা এই ছিল, অহেতুক তাড়না করে কাউকে শিক্ষা দেওয়া যায় না, গাধা পিটিয়ে ঘোড়া করতে গেলে গাধাটাই পঞ্চত্ব পায়। তার প্রমাণ আমি নিজেই। মাস্টার মশাই আমাকে এত প্রহার করেও অঙ্ক শেখাতে পারেননি, বরং যা শিখেছিলুম তা-ও ভুলেছি। এখন দুই আর দুইয়ে চার না পাঁচ হয়, তাই নিজের মধ্যে সন্দেহ জাগে।

পত্রিকার কর্তৃপক্ষ খুশি হয়ে আমাকে দশ টাকা দক্ষিণা দিয়ে গেছেন। মাস্টারমশাইয়ের কাছ থেকে এইটুকুই আমার নগদ লাভ।

তারপরে আরো অনেকদিন পার হয়ে গেল। সেই লেখার কথা ভুলে গেলুম, ভুলে গেলুম মাস্টারমশাইকেও। বয়স বেড়েছে, বিনিদ্র রাত্রিযাপনের মতো অনেক সমস্যা এসে দেখা দিয়েছে জীবনে। বর্তমানের দাবিটা এত বেশি জোরালো যে স্মৃতির দিকে তাকাবার অবসর পর্যন্ত মেলে না।

এমনি সময় বাংলাদেশের এক প্রান্তের একটি কলেজ থেকে ডাক এল। ওঁদের বার্ষিক উৎসব, অতএব আতিথ্য নিতে যেতে হবে ওখানে। এবং বক্তৃতা দিতে হবে।

এই সব উপলক্ষেই বিনাপয়সায় বেড়ানো যায়। তাছাড়া কলকাতা থেকে কেউ বাইরে গেলেই তার রাজোচিত সম্বর্ধনা মেলে—এখানকার চড়ুই পাখিও সেখানে রাজহংসের সম্মান পায়। কলকাতা থেকে দূরত্বটা যত বেশি হয়, আমাদের মতো নগণ্যের পক্ষে ততই সুখাবহ।

আমি সুযোগটা ছাড়তে পারলুম না।

গিয়ে পৌঁছুতে চা-খাবার-আতিথেয়তার উচ্ছ্বাস। ছেলেরা তো এলই, দু'চারজন সম্ভ্রান্ত লোক এসেও বিনীতভাবে আলাপ করে গেলেন। এমন কি খানকয়েক অটোগ্রাফের খাতা পর্যন্ত এগিয়ে এল। রোমাঞ্চিত কলেবরে আমি স্বাক্ষরের সঙ্গে সঙ্গে বাণী বিতরণ করতে লাগলুম, ব্যক্তি হিসেবে আমি যে এত মূল্যবান এর আগে কে ভেবেছিল সে-কথা।

সভায় জাঁকিয়ে বক্তৃতা করা গেল। রবীন্দ্রনাথ থেকে বারোটা উদ্ধৃতি দিলুম, কার একটা ইংরেজি কোটেশন চালিয়ে দিলুম বার্নার্ড শ'র নামে, শেষে দেশের তরুণদের নিদারুণভাবে জাগ্রত হতে বলে যখন টেবিলে একটা প্রকাণ্ড কিল মেরে বক্তৃতা শেষ করলুম, তখন অল্পের জন্যে ফুলদানিটা রক্ষা পেলো। আর হল-ফাটানো হাততালিতে কান বন্ধ হওয়ার জো।

বুড়ো প্রিন্সিপ্যাল পর্যন্ত মুগ্ধ হয়ে আমাকে বললেন, ভারী চমৎকার বলেছেন আপনি, যেমন সারগর্ভ, তেমনি সুমধুর।

আমি বিনীত হাসিতে বললুম, আজ শরীরটা তেমন ভালো নেই, তাই মনের মতো করে বলতে পারলুম না।

পাশে দাঁড়িয়ে থাকা ছেলেরা বিস্ময়ে চোখ কপালে তুলল।

শরীর ভালো নেই, তাতেই এরকম বললেন স্যার। শরীর ভালো থাকলে তো—

অর্থাৎ প্রলয় হয়ে যেত। আমি উদার হাসি হাসলুম। যদিও মনে মনে জানি, এই একটি সর্বার্থসাধক বক্তৃতাই আমার সম্বল, রবীন্দ্র জন্মোৎসব থেকে বনমহোৎসব পর্যন্ত এটাকেই এদিক ওদিক করে চালিয়ে দিই।

স্তুতিতে স্ফীত মনে চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিয়েছি, এমন সময় একটি ছেলে এসে খবর দিলে—এক বুড়ো ভদ্রলোক আমার সঙ্গে দেখা করতে চান।

প্রিন্সিপ্যাল বললেন, বেশ তো, ডেকে আনো এখানে।

ছেলেটি বললে, তিনি আসতে চাইছেন না—বাইরে মাঠে দাঁড়িয়ে রয়েছেন।

আমার বক্তৃতায় নিশ্চয় কেউ অভিভূত হয়েছেন, আমাকে অভিনন্দন জানাবেন। এ অভিজ্ঞতা আগেও হয়েছে। সুতরাং দাক্ষিণ্য-পুলকিত চিত্তে আমি বললুম, আচ্ছা চলো, আমি যাচ্ছি।

হলের বাইরে ছোটো একটা মাঠ তরল অন্ধকারে ঢাকা। অত আলো থেকে বেরিয়ে এসে প্রথমে ভালো করে কিছু দেখতে পেলুম না। তারপর চোখে পড়ল মানুষটিকে। কুঁজো লম্বা চেহারা, মাথার সাদা চুলগুলি চিকমিক করছে।

ডাকলেন, সুকুমার!

আমি চমকে উঠলুম। এখানে কেউ আমার নাম ধরে ডাকতে পারে সেটা যেমন আশ্চর্য, তারও চেয়ে আশ্চর্য ওই গলার স্বর। আমার মনটাকে অদ্ভুতভাবে দুলিয়ে দিল। স্মৃতির অন্ধকার থেকে একটা ভয়ের মৃদু শিহরণ আমার বুকের ভিতর দিয়ে বয়ে গেল।

—আমাকে চিনতে পারছ না সুকুমার? আমি—

চিনেছি। ভয় পাওয়ার অর্থটা বুঝতেও আর বাকি নেই। ওই ডাক শুনে ছেলেবেলায় বহুদিন আমার গায়ের রক্ত হিম হয়ে এসেছে—জানি এখনই একটা ভয়ংকর চড় আমার পিঠের উপর নেমে আসবে। সেই ভয়টার কঙ্কাল লুকিয়ে ছিল মনের চোরাকুঠুরিতে—ওই স্বর বিদ্যুতের আলোর মতো তাকে উদ্ভাসিত করে তুলেছে।

আমার মাথা তখনই ওঁর পায়ে নেমে এল।

—মাস্টারমশাই, আপনি!

মাস্টারমশাই বললেন, বেঁচে থাকো বাবা, যশস্বী হও। রিটায়ার করার পর এখানে এসেই মাথা গুঁজেছি। বাড়ি থেকে বেরুই না, আজ তুমি বক্তৃতা করবে শুনে ছুটে এসেছি। খুব ভালো বলেছ সুকুমার, খুব খুশি হয়েছি।

কিন্তু আমি খুশি হতে পারলুম না। বিজ্ঞানের ছাত্র ছিলেন মাস্টারমশাই, বুদ্ধিতে ছুরির ফলার মতো ঝক্‌ঝক্ করত চোখ। আজ আমার বক্তৃতার ফাঁপা ফানুস দিয়ে যদি ওঁকে ভোলাতে পেরে থাকি, তাহলে সেটা আমার কৃতিত্বে নয়, ওঁর মনেরও বয়স বেড়েছে বলে।

অপরাধীদের মতো চাইলুম, না স্যার, আপনার সামনে—

মাস্টারমশাই আমাকে বলতে দিলেন না।

তোমরাই তো আমাদের গর্ব, আমাদের পরিচয়। কিছুই দিতে পারিনি, খালি শাসন করেছি, পীড়ন করেছি।—বলতে বলতে জামার পকেট থেকে বের করলেন শতচ্ছিন্ন এক জীর্ণ পত্রিকা: একদিন আমার ছেলে এইটে এনে আমাকে দেখালে। পড়ে আনন্দে আমার চোখে জল এল। কতকাল হয়ে গেল, তবু সুকুমার আমাকে মনে রেখেছে, আমাকে নিয়ে গল্প লিখেছে। সকলকে এই লেখা আমি দেখাই, বলি দেখো, আমার ছাত্র আমাকে অমর করে দিয়েছে।

মুহূর্তে আমার জিভ শুকিয়ে গেল, লজ্জায় আত্মগ্লানিতে আমার মাটিতে মিশে যেতে ইচ্ছে করল। একটা কিছু বলতে চেষ্টা করলুম, কিন্তু মুখে কথা ফুটল না।

মাস্টারমশাইয়ের গলা ধরে এসেছিল। একটু চুপ করে থেকে বললেন, কী যে আমার আনন্দ হয়েছে সুকুমার, কী বলব! তোমার এই লেখাটা সব সময়ে আমার সঙ্গে সঙ্গে থাকে। দু-একজন বলে, যেমন ধরে ধরে মারতেন, তেমনি বেশ শুনিয়ে দিয়েছে আপনাকে। আমি বলি, শোনাবে কেন—কত শ্রদ্ধা নিয়ে লিখেছে। আর সত্যিই তো—অন্যায় যদি করেই থাকি, ওরা ছাত্র—ওরা সন্তান—বড়ো হলে সে অন্যায় আমার শুধরে দেবে বই কি। জানো সুকুমার, আনন্দে তোমাকে আমি একটা চিঠিও লিখেছিলুম। কিন্তু পাঠাতে সাহস হয়নি। তোমরা এখন বড়ো হয়ে গেছ—এখন—

আর বলতে পারলেন না। আবছা আলোটায় এখন অভ্যস্ত হয়ে উঠেছিলুম, দেখলুম, মাস্টারমশাইয়ের চোখ দিয়ে জল পড়ছে।

মনে হলো, স্নেহ-মমতা-ক্ষমার এক মহাসমুদ্রের ধারে এসে দাঁড়িয়েছি। সেই স্নেহ—কোটি মণি-মাণিক্য দিয়ে যার পরিমাপ হয় না; সেই মমতা—যার দাম সংসারের সব ঐশ্বর্যের চাইতে বেশি; সেই ক্ষমা—কুবেরের ভাণ্ডারকে ধরে দিয়েও যা পাওয়া যায় না।

আমি তাঁকে দশ টাকায় বিক্রি করেছিলুম। এ অপরাধ আমি বইব কী করে, এ লজ্জা আমি কোথায় রাখব!

এই জীবন

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

বাঁচতে হবে বাঁচার মতন, বাঁচতে বাঁচতে
এই জীবনটা গোটা একটা জীবন হয়ে
জীবন্ত হোক
আমি কিছুই ছাড়ব না, এই রোদ ও বৃষ্টি
আমাকে দাও ক্ষুধার অন্ন
শুধু যা নয় নিছক অন্ন
আমার চাই সব লাবণ্য
নইলে গোটা দুনিয়া খাব!
আমাকে কেউ গ্রামে-গঞ্জে ভিখারি করে
পালিয়ে যাবে?
আমায় কেউ নিলাম করবে সুতো কলে,
কামারশালায়?
আমি কিছুই ছাড়ব না আর, এখন আমার
অন্য খেলা
পদ্মপাতায় ফড়িং যেমন আপনমনে খেলায় মাতে
গোটা জীবন
মানুষ সেজে আসা হলো,
মানুষ হয়েই ফিরে যাব
বাঁচতে হবে বাঁচার মতন, বাঁচতে বাঁচতে
এই জীবনটা গোটা একটা জীবন হয়ে
জীবন্ত হোক!

নব নব সৃষ্টি

সৈয়দ মুজতবা আলী

সংস্কৃত ভাষা আত্মনির্ভরশীল। কোনো নূতন চিন্তা, অনুভূতি কিংবা বস্তুর জন্য নবীন শব্দের প্রয়োজন হলে সংস্কৃত ধার করার কথা না ভেবে আপন ভাণ্ডারে অনুসন্ধান করে, এমন কোনো ধাতু বা শব্দ সেখানে আছে কি না যার সামান্য অদল বদল করে কিংবা পুরোনো ধাতু দিয়ে নবীন শব্দটি নির্মাণ করা যায় কি না। তার অর্থ অবশ্য এ নয় যে, সংস্কৃত কস্মিনকালেও বিদেশি কোনো শব্দ গ্রহণ করেনি। নিয়েছে, কিন্তু তার পরিমাণ এতই মুষ্টিমেয় যে, সংস্কৃতকে স্বয়ংসম্পূর্ণ ভাষা বলাতে কারও কোনো আপত্তি থাকার কথা নয়।

প্রাচীন যুগের সব ভাষাই তাই। হিব্রু, গ্রিক, আবেস্তা এবং ঈষৎ পরবর্তী যুগের আরবিও আত্মনির্ভরশীল এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই স্বয়ংসম্পূর্ণ।

বর্তমান যুগের ইংরেজি ও বাংলা আত্মনির্ভরশীল নয়। আমরা প্রয়োজন মতো এবং অপ্রয়োজনেও ভিন্ন ভিন্ন ভাষা থেকে শব্দ নিয়েছি এবং নিচ্ছি। পাঠান-মোগল যুগে আইন-আদালত খাজনা-খারিজ নূতন রূপে দেখা দিল বলে আমরা আরবি ও ফার্সি থেকে প্রচুর শব্দ গ্রহণ করেছি। পরবর্তী যুগে ইংরেজি থেকে ইংরেজির মারফতে অন্যান্য ভাষা থেকে নিয়েছি এবং নিচ্ছি।

বিদেশি শব্দ নেওয়া ভালো না মন্দ সে প্রশ্ন অবান্তর। নিয়েছি এবং এখনও সজ্ঞানে আপন খুশিতে নিচ্ছি এবং শিক্ষার মাধ্যমরূপে ইংরেজিকে বর্জন করে বাংলা নেওয়ার পর যে আরও প্রচুর ইউরোপীয় শব্দ আমাদের ভাষায় ঢুকবে, সে সম্বন্ধেও কারও কোনো সন্দেহ নেই। আলু-কপি আজ রান্নাঘর থেকে তাড়ানো মুশকিল, বিলিতি ওষুধ প্রায় সকলেই খান, ভবিষ্যতে আরও নূতন নূতন ওষুধ খাবেন বলেই মনে হয়। এই দুই বিদেশি বস্তুর ন্যায় আমাদের ভাষাতেও বিদেশি শব্দ থেকে যাবে, নূতন আমদানিও বন্ধ করা যাবে না।

পৃথিবীতে কোনো জিনিসই সম্পূর্ণ অসম্ভব নয়। অন্তত চেষ্টা করাটা অসম্ভব নাও হতে পারে। হিন্দি উপস্থিত সেই চেষ্টাটা করছেন—বহু সাহিত্যিক উঠে পড়ে লেগেছেন, হিন্দি থেকে আরবি, ফার্সি এবং ইংরেজি শব্দ তাড়িয়ে দেবার জন্য। চেষ্টাটার ফল আমি হয়তো দেখে যেতে পারব না। আমার তরুণ পাঠকেরা নিশ্চয়ই দেখে যাবেন। ফল যদি ভালো হয় তখন তাঁরা না হয় চেষ্টা করে দেখবেন। (বলা বাহুল্য, রবীন্দ্রনাথ স্বচ্ছন্দে লিখেছেন, 'আব্রু দিয়ে, ইজ্জৎ দিয়ে, ইমান দিয়ে, বুকের রক্ত দিয়ে।' নজরুল ইসলাম 'ইনকিলাব'—'ইনক্লাব' নয়—এবং 'শহিদ' শব্দ বাংলায় ঢুকিয়ে গিয়েছেন। বিদ্যাসাগর 'সাধু' রচনায় বিদেশি শব্দ ব্যবহার করতেন না, বেনামিতে লেখা 'অসাধু' রচনায় চুটিয়ে আরবি-ফার্সি ব্যবহার করতেন। আর অতিশয় নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ পণ্ডিত হরপ্রসাদ আরবি-ফার্সি শব্দের বিরুদ্ধে জিহাদ ঘোষণা করা 'আহাম্মুখী' বলে মনে করতেন। 'আলাল' ও 'হুতোম'-এর ভাষা বিশেষ উদ্দেশ্যে নির্মিত হয়েছিল; সাধারণ বাংলা এ-স্রোতে গা ঢেলে দেবে না বলে তার উল্লেখ এস্থলে নিষ্প্রয়োজন এবং হিন্দির বঙ্কিম স্বয়ং প্রেমচন্দ্র হিন্দিতে বিস্তর আরবি-ফার্সি ব্যবহার করেছেন।)

এস্থলে আর একটি কথা বলে রাখা ভালো। রচনার ভাষা তার বিষয়বস্তুর উপর নির্ভর করে। শংকরদর্শনের আলোচনায় ভাষা সংস্কৃতশব্দবহুল হবেই, পক্ষান্তরে মোগলাই রেস্তোরাঁর বর্ণনাতে ভাষা অনেকখানি 'হুতোম'-ঘ্যাঁষা হয়ে যেতে বাধ্য। 'বসুমতী'র সম্পাদকীয় রচনার ভাষা এক—তাতে আছে গাম্ভীর্য, 'বাঁকা চোখে'র ভাষা ভিন্ন—তাতে থাকে চটুলতা।

বাংলায় যে-সব বিদেশি শব্দ ঢুকেছে তার ভিতরে আরবি, ফার্সি এবং ইংরেজিই প্রধান। সংস্কৃত শব্দ বিদেশি নয়, এবং পোর্তুগিজ, ফরাসি, স্প্যানিশ শব্দ এতই কম যে, সেগুলো নিয়ে অত্যধিক দুশ্চিন্তা করার কোনো কারণ নেই।

বাংলা ভিন্ন অন্য যে-কোনো ভাষার চর্চা আমরা করি না কেন, সে ভাষার শব্দ বাংলাতে ঢুকবেই। সংস্কৃত চর্চা এদেশে ছিল বলে বিস্তর সংস্কৃত শব্দ বাংলায় ঢুকেছে, এখনও আছে বলে অল্পবিস্তর ঢুকছে, যতদিন থাকবে ততদিন আরও ঢুকবে বলে আশা করতে পারি। স্কুল-কলেজ থেকে যে আমরা সংস্কৃত চর্চা উঠিয়ে দিতে চাই না তার অন্যতম প্রধান কারণ বাংলাতে এখনও আমাদের বহু সংস্কৃত শব্দের প্রয়োজন, সংস্কৃত চর্চা উঠিয়ে দিলে আমরা অন্যতম প্রধান খাদ্য থেকে বঞ্চিত হব।

ইংরেজির বেলাতেও তাই। বিশেষ করে দর্শন, নন্দনশাস্ত্র, পদার্থবিদ্যা, রসায়নবিদ্যা ইত্যাদি জ্ঞান এবং ততোধিক প্রয়োজনীয় বিজ্ঞানের শব্দ আমরা চাই। রেলের ইঞ্জিন কী করে চালাতে হয়, সে সম্বন্ধে বাংলাতে কোনো বই আছে বলে জানি নে, তাই এসব টেকনিক্যাল শব্দের প্রয়োজন যে আরও কত বেশি সে সম্বন্ধে কোনো সুস্পষ্ট ধারণা এখনও আমাদের মনের মধ্যে নেই। সুতরাং ইংরেজি চর্চা বন্ধ করার সময় এখনও আসেনি।

একমাত্র আরবি-ফার্সি শব্দের বেলা অনায়াসে বলা যেতে পারে যে, এই দুই ভাষা থেকে ব্যাপকভাবে আর নূতন শব্দ বাংলাতে ঢুকবে না। পশ্চিম বাংলাতে আরবি-ফার্সি চর্চা যাবো-যাবো করছে, পূর্ব বাংলায়ও এ-সব ভাষার প্রতি তরুণ সম্প্রদায়ের কৌতূহল অতিশয় ক্ষীণ বলে তার আয়ু দীর্ঘ হবে বলে মনে হয় না এবং শেষ কথা, আরব-ইরানে অদূর ভবিষ্যতে যে হঠাৎ কোনো অভূতপূর্ব জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চা আরম্ভ হয়ে বাংলাকে প্রভাবিত করবে তার সম্ভাবনাও নেই।

কিন্তু যে-সব আরবি-ফার্সি শব্দ বাংলাতে ঢুকে গিয়েছে তার অনেকগুলো যে আমাদের ভাষাতে আরও বহুকাল ধরে চালু থাকবে, সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই এবং দ্বিতীয়ত কোনো কোনো লেখক নূতন বিদেশি শব্দের সন্ধান বর্জন করে পুরোনো বাংলার—'চণ্ডী' থেকে আরম্ভ করে 'হুতোম' পর্যন্ত—অচলিত আরবি-ফার্সি শব্দ তুলে নিয়ে সেগুলো কাজে লাগাবার চেষ্টা করছেন। কিছুদিন পূর্বেও এই এক্সপেরিমেন্ট করা অতিশয় কঠিন ছিল, কিন্তু অধুনা বিশ্ববিদ্যালয়ের কল্যাণে অনেক ছাত্র-ছাত্রীকে বাধ্য হয়ে পুরোনো বাংলা পড়তে হয়—তারা এই সব শব্দের অনেকগুলো অনায়াসে বুঝতে পারবে বলে অচলিত অনেক আরবি-ফার্সি শব্দ নূতন মেয়াদ পাবে।

এই পরিস্থিতির সামনে জীবন্মৃত এসব শব্দের একটা নূতন খতেন নিলে ভালো হয়।

ভারতীয় মক্তব-মাদ্রাসায় যদিও প্রচুর পরিমাণে আরবি ভাষা পড়ানো হয়েছিল, তবু কার্যত দেখা গেল ভারতীয় আর্যগণ ইরানি আর্য সাহিত্য অর্থাৎ ফার্সির সৌন্দর্যে অভিভূত হলেন বেশি। উর্দু সাহিত্যের মূল সুর তাই ফার্সির সঙ্গে বাঁধা—আরবির সঙ্গে নয়। হিন্দি গদ্যের উপরও বাইরের যে প্রভাব পড়েছে সেটা ফার্সি—আরবি নয়।

একদা ইরানে যে রকম আর্য ইরানি ভাষা ও সেমিতি আরবি ভাষার সংঘর্ষে নবীন ফার্সি জন্মগ্রহণ করেছিল, ভারতবর্ষে সেই সংঘর্ষের ফলে সিন্ধি, উর্দু ও কাশ্মীরি সাহিত্যের সৃষ্টি হয়। কিন্তু আরবির এই সংঘর্ষ ফার্সির মাধ্যমে ঘটেছিল বলে কিংবা অন্য যে-কোনো কারণেই হোক, ভারতবর্ষীয় এ তিন ভাষা ফার্সির মতো নব নব সৃষ্টি দিয়ে ঐশ্বর্যশালী সাহিত্যসৃষ্টি করতে পারল না। উর্দুতে কবি ইকবালই এ তত্ত্ব সম্যক হৃদয়ঙ্গম করেছিলেন ও নূতন সৃষ্টির চেষ্টা করে উর্দুকে ফার্সির অনুকরণ থেকে কিঞ্চিৎ নিষ্কৃতি দিতে সক্ষম হয়েছিলেন।

বাঙালির সর্বশ্রেষ্ঠ সাহিত্যসৃষ্টি তার পদাবলি কীর্তনে। এ সাহিত্যের প্রাণ এবং দেহ উভয়ই খাঁটি বাঙালি। এ সাহিত্যে শুধু যে মহাভারতের শ্রীকৃষ্ণ বাংলায় খাঁটি কানুরূপ ধারণ করেছেন তাই নয়, শ্রীমতী শ্রীরাধাও যে একেবারে খাঁটি বাঙালি মেয়ে সে-বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। ভাটিয়ালির নায়িকা, বাউলের ভক্ত, মুরশিদিয়ার আশিক ও পদাবলির শ্রীরাধা একই চরিত্র একই রূপে প্রকাশ পেয়েছেন।

বাঙালির চরিত্রে বিদ্রোহ বিদ্যমান। তার অর্থ এই যে, কী রাজনীতি, কী ধর্ম, কী সাহিত্য, যখনই যেখানে সে সত্য শিব সুন্দরের সন্ধান পেয়েছে তখনই সেটা গ্রহণ করতে চেয়েছে; এবং তখন কেউ 'গতানুগতিক পন্থা' 'প্রাচীন ঐতিহ্য'-এর দোহাই দিয়ে সে প্রচেষ্টায় বাধা দিতে গেলে তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছে। এবং তার চেয়েও বড়ো কথা,—যখন সে বিদ্রোহ উচ্ছৃঙ্খলতায় পরিণত হতে চেয়েছে, তখন তার বিরুদ্ধে আবার বিদ্রোহ করেছে।

এ বিদ্রোহ বাঙালি হিন্দুর ভিতরই সীমাবদ্ধ নয়। বাঙালি মুসলমানও এ কর্মে পরম তৎপর। ধর্ম বদলালেই জাতির চরিত্র বদলায় না।

(সংক্ষেপিত ও সম্পাদিত)

নূতন জীবন

হিরণ্ময়ী দেবী

দেখ চেয়ে একবার অসীম রহস্যময়
অনন্ত এ বিশ্ব;
দেখ সেথা কিবা গায় কোন কথা বলে তোর
প্রতি নব দৃশ্য।...
প্রতিদিন ফুল ফুটে প্রতিদিন ঝরে তারা
ফোটে নব ফুল।
রবি অস্তাচলে যায় নূতন তপন আনে
আলোক অতুল।
একটি বিহঙ্গগীত চিরতরে থেমে যায়
শত পাখি গায়,
একটি বসন্ত যায়, আবার দক্ষিণে ছুটে
বসন্ত বায়।
একটি তারকা খসে আকাশের শত তারা
ঢালে জ্যোতি-হাসি
একটি জাহ্নবী ঢেউ সাগরে মিলায়ে যায়
আপনা বিনাশি।
হিমগিরি হতে পুন তটিনী বহিয়া আনে
নূতন জীবন,
বিরহের গীতখানি না হইতে অবসান
গাহে রে মিলন।

ঝোড়ো সাধু

মহাশ্বেতা দেবী

ট্রেনের কামরায় লোকটাকে দেখেছিল তথাগত। পুরী থেকে ফেরার সময়ে কী একটা স্টেশনে। চিল্কার কাছে ভীষণ ঝড় হয়েছে। অনেক নৌকো ডুবেছে। অনেক গাছপালা বাড়িঘর তছনছ হয়েছে। সে কথাই সবাই বলাবলি করছিল।

লোকটার বয়স কত, তা বোঝা যায় না। একটা পোঁটলা নিয়ে সে উঠল। দরজার কাছে দাঁড়াল। তথাগতকে অবাক করে টিকেট চেকার বললেন, 'ওখানেই থাকো সাধু। ঝড় উঠলে ট্রেন থামিয়ে দেবো।'

'এখন আর হবে না বাবু।'

চেকার বিড়বিড় করে বললেন, 'অপয়া!'

'হ্যাঁ বাবু।'

'দোষটা কাটাতে পারছ না?'

'খোঁজ পাচ্ছি না যে।'

‘চিল্কাতে আছে বলে শুনেছিলে?’

‘হ্যাঁ বাবু।’

‘এখন কোথায় যাচ্ছ?’

‘একটা দ্বীপ খুঁজছি।’

‘দ্বীপ?’

‘হ্যাঁ বাবু। নির্জন ছোটো ছোটো দ্বীপের মধ্যে মানুষজন থাকে না! সেখানে গিয়ে থাকব। ঝড় হলে আমার ক্ষতি হবে। মানুষ কষ্ট পাবে না।’

‘বটে! নৌকো ডুববে না?’

‘তাও তো বটে।’

চেকার চলে গেলে তথাগত লোকটার সঙ্গে আলাপ করেছিল। মাধ্যমিক দিয়ে ওরা কয়েকজন বন্ধু পুরীতে এক বন্ধুর মামাবাড়িতে বেড়াতে এসেছিল। দিন চারেক যেতে-না-যেতে ফিরে যেতে হচ্ছে। মায়ের খুব অসুখ। মনে দুশ্চিন্তা নিয়ে যাচ্ছে। ফলে ট্রেনে ঘুম হচ্ছে না।

কিছুতেই লোকটা মুখ খুলতে চায় না। অনেক তোয়াজ করার পর সে একটি অবিশ্বাস্য কাহিনি বলে।

ওর দেশ ময়ূরভঞ্জে। বাংলা ও ভালোই জানে। নৌকো তৈরি ছিল ওর কাজ। আর সেজন্যেই ও ওড়িশা ও মেদিনীপুরের মাঝামাঝি কোনো জায়গায় গিয়ে পড়ে। সেখানে ও খবর পায় এক বুড়ো জেলের। যাকে সবাই ভয় করত। সে নাকি ঝড় তুলতে পারত। জল, ঝড়ের দানোরা ছিল ওর বশ।

এমন একটা কথা শুনে ওর পেছন পেছন ঘুরতে থাকে। লোকটা বলেছিল, ‘না না, এ বিদ্যে শেখাব না। ঝড় তুলতে শিখলে, ঝড় থামাতেও শিখতে হবে। ওটা না শিখলে দানোরা তোমার সঙ্গে ফিরবে আর তুমি যেখানে যাবে সেখানে ঝড় উঠবে নিদারুণ।’

দুটো বিদ্যে একসঙ্গেই শিখতে হয়। অনেক সাধ্যসাধনার পর লোকটা সাধুকে নিয়ে যায় এক নির্জন সমুদ্রতীরে। ও বারবার বলেছিল, ‘দুটো শিখে নেবে। তারপর পরখ কোরো। নইলে ঝড় তোমায় ছাড়বে না। থামাবার বিদ্যে জান না। থামাতেও পারবে না।’

নির্জন সমুদ্রতীর ছিল। বালির ওপর কীসব আঁকিবুকি কেটে লোকটা সাধুকে মন্ত্র শেখাতে শুরু করে।

সাধুকে সে দ্বিতীয় মন্ত্রটা শেখাবে, তার আগেই সাধু সব সতর্কতা ভুলে মনে মনে মন্ত্রটা উচ্চারণ করেছিল। লোকটা ধাপ্পা দিচ্ছে, না সত্যি কথা বলছে, তা দেখতে হবে না?

যেমন বলা, সেই যে ঝড় উঠল, সে একেবারে রাক্ষুসে ঝড়। সমুদ্রের জল ফুলে ফেঁপে আছড়ে পড়ল ওদের ওপর। ভয়ে সাধু জ্ঞান হারাল।

জ্ঞান হতে দেখে যে, সে লোকটার পাত্তা নেই। সে একা পড়ে আছে। এসব কথা জানাজানি হলে আশপাশের লোকজন ওকে মেরে ফেলত বোধ হয়। সাধু ওখানে থেকে পালাল।

সাধু বলল, ‘সেই থেকে যারা জানে তারা আমাকে ঝোড়ো সাধু বলে বাবু! এই চেকারবাবু জানবে। আমি ট্রেনে যাচ্ছিলাম, ঝড় উঠে ট্রেন থামাতে হয়েছিল তো! কত জায়গায় কত সর্বনাশ হচ্ছে বাবু, আমার কোনো

ক্ষতি দানোরা করে না।'

'তুমি দ্বীপ খুঁজে বেড়াচ্ছ?'

হ্যাঁ বাবু। এমন জায়গায় যেতে চাই, যেখানে কোনো মানুষজন থাকে না। সেখানে পড়ে থাকব। না খেয়ে মরে যাব। যা হবার, আমার হবে। এমন কোনো জায়গার হদিস দিতে পার আমাকে?

'আমি তো জানি না।'

'বুড়োরাই বলতে পারে না। তুমি তো ছেলেমানুষ। কোথায় যে যাই?'

'ঝড় আসছে, তা তুমি বোঝ?'

'হ্যাঁ বাবু। শরীর অস্থির করে তো।'

'তোমার কেউ নেই?'

'আছে তো। তাদের কাছে যেতে ইচ্ছে করে, আবার ভয় করে। ক্যানিং-এ আমার দাদা থাকে। বারবার বলছে যে এসো। আমার কাছে থাকো। বনগাঁর আমার এক ভাগ্নে মিষ্টির দোকান খুলেছে গাইঘাটায়।'

'তুমি ওসব জায়গা চেন?'

'খুব চিনি।'

'এখন কোথায় যাচ্ছ?'

'কালীঘাটে একটা ভিখিরি থাকে। সে নাকি দানো ছাড়াতে পারে। তাই যাচ্ছি।'

হাওড়া পৌঁছে লোকটা টুপ করে ভিড়ের মধ্যে হারিয়ে গিয়েছিল। তথাগতও ক্রমে ওর কথা ভুলে গেল।

১৯৮২ সালে সুন্দরবনের দিকে প্রচণ্ড ঝড়ের কথা সম্ভবত তোমরা ভুলে গেছ।

সে সময়ে তথাগত ডায়মন্ডহারবার শহরে বসে ছিল। মা গিয়েছিলেন মামাবাড়ি ডায়মন্ডহারবারে। তাঁকে আনতে গিয়েছিল তথাগত। মামাবাড়ির আবদার খাবে। সজনেখালি—বকখালি বেড়াবে, এমন কত পরিকল্পনা। সবই ভেস্তে গেল। মামা মৎস্যউন্নয়ন বিভাগে বড়োদরের অফিসার। তিনি তাঁর দপ্তরের নৌকো, লঞ্চ, সব নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন ছোটাছুটিতে।

ডায়মন্ডহারবার স্টেশনেই একটা লোক অত্যন্ত বিষণ্ণ মুখে মাথায় হাত দিয়ে বসে ছিল। তাকে দেখেই তথাগত চমকে উঠল। হ্যাঁ, সেই ঝোড়ো সাধু। সেই কাঁচাপাকা কোঁকড়া চুল, গলায় তুলসীমালা, চোখে সেই করুণ চাহনি।

'তুমি এখানে?'

'আপনি ... আপনি ... ও! তুমি তো সেই বাবু। রাতে রেলগাড়িতে দেখা হয়েছিল। হ্যাঁ বাবু, আমি! দাদার অসুখ শুনে দেখতে গেলাম, তা সকলকে সর্বনাশ করে এলাম ... বাবু, খোকাবাবু! আমাকে ঠেলা দিয়ে রেলগাড়ির নীচে ফেলে দিতে পার?' একথা বলে ও কাঁদতে লাগল।

তথাগত বলল, 'তুমি কলকাতায় আমাদের বাড়ি এসো। আমি তোমাকে এক জায়গায় নিয়ে যাব?'

'কোথায় খোকাবাবু?'

‘আমার মাস্টারমশাইয়ের দাদা তোমার এ ব্যাপারটা ... বুঝলে সাধুদা! একটা ক্ষমতা তো?’

সাধু কেমন অবাক হয়ে গেল। বলল, ‘তুমি আমার নাম মনে রেখেছ খোকাবাবু! তুমি আমায় দাদা বললে!’

‘ও কী, চোখে জল!’

‘কেউ বলে না খোকাবাবু। সবাই বলে তুই ঝোড়ো, তুই অপয়া, সবাই ... বিস্কুট খাবে খোকাবাবু?’

‘না সাধুদা। আমার ট্রেন আসছে। তুমি এসো কিন্তু। আমার ঠিকানা লিখে দিচ্ছি। এসো কিন্তু।’

‘খোকাবাবু! তোমার সেই মাস্টারমশাইয়ের দাদা আমাকে একটা নির্জন দ্বীপ খুঁজে দিতে পারবে না?’

‘দ্বীপের খোঁজ নিশ্চয়ই দেবে। তোমাকে একলা ছাড়বে নাকি? তোমার সঙ্গে অনেক লোক থাকবে, কত বিজ্ঞানী, কত পণ্ডিত, তারা দেখবে ব্যাপারটা।’

‘কিন্তু...’

বলতে বলতে ট্রেন এসে গিয়েছিল। সাধু যে আরও কী বলতে যাচ্ছিল, তা শোনা হয়নি তথাগতের। তবে ট্রেনের জানলা থেকে ও দেখেছিল, সাধু ওর দিকে চেয়ে হাত নাড়ছে। তার মুখটা খুব হাসি হাসি।

কলকাতায় ও ওর মাস্টারমশাইয়ের দাদার সঙ্গে কথা বলেছিল। ভূমিকম্প বিষয়ে বিশেষজ্ঞ ডক্টর দেবেন্দু রায়ের নাম কে না জানে। তিনি বলেছিলেন, ‘লোকটাকে বেশ দেখতে ইচ্ছে করছে। অবশ্য মনে হচ্ছে ওর উপস্থিত থাকা আর ঝড় ওঠার ব্যাপারটা নেহাত অস্বাভাবিক যোগাযোগ। এসব জাদু-বিশ্বাস আগে খুব ছিল। রবার্ট লুই স্টিভেনসন এমন বিশ্বাস নিয়ে গল্প লিখেছেন। আর. এম. আর. জেমসের নাম কে না জানে। তিনিও লিখেছেন।’

সাধু কিন্তু এসেছিল। ও কোনো বাড়িতে আসতে রাজি হয়নি। না, ফাঁকা জায়গাই ভালো। অবশেষে দক্ষিণ কলকাতার বিবেকানন্দ পার্কে সন্ধেবেলা সবাই এসেছিল। দেবেন্দু রায়, মেঘ বিশেষজ্ঞ চিন্তামণি নরসিংহ, আবহাওয়াবিশারদ ড. মণিময় দত্ত—কলকাতাকে তুচ্ছ ভেবো না। এ শহরে অনেক গুণী, অনেক জ্ঞানী থাকেন। এঁদের সঙ্গে ছিল এক তরুণ সাংবাদিক মোহন প্যাটেল। সে-ই ছিল সবচেয়ে অবিশ্বাসী। মজা দেখতে এসেছে, এমনি ভাব তার।

সাধু এসে বসল। সন্ধে হয় হয় নির্মেঘ আকাশ। দক্ষিণে সাদার্ন অ্যাভিনিউ, তিন দিকে আলো ঝলমল কলকাতা। দেবেন্দু রায় কথা শুরু করলেন। তথাগত বেজায় ব্যস্ত, ‘বলো না সাধুদা, আমাকে যা যা বলেছিলে?’

সাধু সবই বলল।

শুনে সবাই চুপচাপ। সাধু আপন মনেই যেন বলল, ‘এরা তো বিশ্বাস করছে না, এরা ভাবছে সবই গাঁজা।’

মোহন প্যাটেল বলল, ‘সব ধাপ্পা।’

‘ধাপ্পা? কেন বাবু, ধাপ্পা হবে কেন? আপনারাই তো আমাকে ডেকেছেন, আমি তো আপনার হতে আসিনি।’

‘তুমি একটা ডিলিউশনে ভুগছ।’

‘বটে! ইংরিজিতে কী বললে?’

‘এ হয় না, হতে পারে না।’

সাধু খপ করে তথাগতর হাত দুটো চেপে ধরল। বলল, ‘তুমি বলো খোকাবাবু, ছোট্ট করে এদের একটু দেখাই।’

কী যে বলল সে বিড়বিড় করে, তা শোনাই গেল না। যা ঘটল, তা তথাগত জীবনে ভুলবে না। প্রচণ্ড ঝড়ে

গাছপালা সব দুলে উঠল, আর বাতাসের ধাক্কায় মানুষগুলি মাটিতে পড়ে গড়াতে গড়াতে ছড়িয়ে গেল। ঝড়টা পার্ক ছাড়িয়ে লেকের গাছপালা দুলিয়ে দক্ষিণে দৌড় মারল।

তারপর সব শান্ত, শান্ত। তথাগত শুধু বলল, 'থেমে গেল?'

'এ তো ডেকে আনা ঝড়। তাতেই থামল। কিন্তু নিজে থেকে আসে যখন, তখন থামে না। চলি খোকাবাবু।'

দেবেন্দু রায় চেঁচিয়ে উঠলেন, 'যেতে দিয়ো না ওকে। ধরে রাখো না ওকে। ধরে রাখো। ওকে নিয়ে আমি বিদেশে যাব, লোককে দেখাব।' মোহন প্যাটেল কাতর গলায় বলল, 'আমার চশমা?'

সাধু দাঁড়াল না। চলে গেল হনহন করে।

সেই শেষ। সাধুকে আর দেখেনি তথাগত। তবে গাইঘাটার ঝড়ের কথা তো তোমরা জান। কী কাণ্ড হয়ে গেল সেখানে। কত লোক মারা পড়ল।

গাইঘাটা ঘুরে এসে মোহন প্যাটেল একটি ছবি দেখিয়েছিল তথাগতকে। গাছ বুকে নিয়ে একটি লোক মরে পড়ে আছে। মুখটা খুব প্রশান্ত, যেন হাসি হাসি।

'চিনতে পার?'

'হ্যাঁ চিনেছি।'

'গাইঘাটা গিয়েছিল কেন?'

'ওখানে ... ওর ... কে যেন থাকত...'

'ওঃ! মুখটা দেখেছ?'

'দেখলাম।'

'হাসছে কেন?'

তথাগত হাসি দিয়ে মনের বেদনা ঢেকে আস্তে বলল, 'ও মুক্তি পেয়ে গেছে, তাই হাসছে।'

তৃতীয় পাঠ

পথে প্রবাসে

অন্নদাশংকর রায়

ভারতবর্ষের মাটির ওপর থেকে শেষবারের মতো পা তুলে নিলুম আর সদ্যোজাত শিশুর মতো মায়ের সঙ্গে আমার যোগসূত্র এক মুহূর্তে ছিন্ন হয়ে গেল। একটি পদক্ষেপে যখন সমগ্র ভারতবর্ষের কক্ষচ্যুত হয়ে অনন্ত শূন্যে পা বাড়ালুম তখন যেখান থেকে পা তুলে নিলুম সেই পদ-পরিমাণ ভূমি যেন আমাকে গোটা ভারতবর্ষেরই স্পর্শ-বিরহ অনুভব করিয়ে দিচ্ছিল; প্রিয়জনের আঙুলের ডগাটুকুর স্পর্শ যেমন প্রিয়জনের সকল দেহের সম্পূর্ণ স্পর্শ অনুভব করিয়ে দেয়, এও যেন তেমনি।

জাহাজে উঠে বম্বে দেখতে যেমন সুন্দর তেমনি করুণ। এত বড়ো ভারতবর্ষ এসে এতটুকু নগরপ্রান্তে ঠেকেছে, আর কয়েক মুহূর্তে ওটুকুও স্বপ্ন হবে, তখন মনে হবে আরব্য উপন্যাসের প্রদীপটা যেমন বিরাটাকার দৈত্য হয়ে আলাদিনের দৃষ্টি জুড়েছিল, ভারতবর্ষের মানচিত্রখানা তেমনি মাটি জল ফুল পাখি মানুষ হয়ে আজন্ম আমার চেতনা হয়েছিল, এতদিনে আবার যেন মানচিত্রে রূপান্তরিত হয়েছে।

আর মানচিত্রে যাকে ভারতবর্ষ ও আফ্রিকার মাঝখানে গোষ্পদের মতো দেখাত সেই এখন হয়েছে পায়ের তলার আরব সাগর, পূর্ব পশ্চিম উত্তর দক্ষিণ কোনো দিকে চক্ষু তার অবধি পায় না। ঢেউগুলো তার অনুচর হয়ে আমাদের জাহাজখানাকে যেন গলাধাক্কা দিতে দিতে তার চৌকাঠ পার করে দিতে চলেছে। ঋতুটার নাম বর্ষা ঋতু, মনসুনের প্রভঞ্জনাহুতি পেয়ে সমুদ্র তার শত সহস্র জিহ্বা লকলক করছে, জাহাজখানাকে একবার এদিকে কাৎ করে একবার ওদিক কাৎ করে যেন ফুটন্ত তেলে পাঁপরের মতো উল্টে পাল্টে ভাজছে।

জাহাজ টলতে টলতে চলল, আর জাহাজের অধিকাংশ যাত্রি-যাত্রিণী ডেক ছেড়ে শয্যা আশ্রয় করলেন। অসহ্য সমুদ্রপীড়ায় প্রথম তিন দিন আচ্ছন্নের মতো কাটল, কারুর সঙ্গে দেখা হবার জো ছিল না, প্রত্যেকেই নিজের নিজের ক্যাবিনে শয্যাশায়ী। মাঝে মাঝে দু'একজন সৌভাগ্যবান দেখা দিয়ে আশ্বাসন করেন, ডেকের খবর দিয়ে যান। আর ক্যাবিন স্টুয়ার্ড খাবার দিয়ে যায়। বলা বাহুল্য জিহ্বা তা গ্রহণ করতে আপত্তি না করলেও উদর তা রক্ষণ করতে অস্বীকার করে।

ক্যাবিনে পড়ে পড়ে বমনে ও উপবাসে দিনের পর রাত রাতের পর দিন এমন দুঃখে কাটে যে, কেউ-বা ভাবে যে মরণ হলেই বাঁচি, কেউ-বা ভাবে যে মরতে আর দেরি নেই । জানিনে হরবল্লভের মতো কেউ ভাবে কি না যে, মরে তো গেছি দুর্গানাম করে কী হবে। সমুদ্রপীড়া যে কী দুঃসহ তা ভুক্তভোগী ছাড়া অপর কেউ ধারণা করতে পারবে না। হাতের কাছে রবীন্দ্রনাথের 'চয়নিকা',— মাথার যন্ত্রণায় অমন লোভনীয় বইও পড়তে ইচ্ছা করে না। ইচ্ছা করে কেবল চুপ করে পড়ে থাকতে, পড়ে পড়ে আকাশ পাতাল ভাবতে।

সদ্য-দুঃখার্ত কেউ সংকল্প করে ফেললেন যে, এডেনে নেমেই দেশে ফিরে যাবেন, সমুদ্রযাত্রার দুর্ভোগ আর সইতে পারবেন না। তাঁকে স্মরণ করিয়ে দেওয়া হলো এডেন থেকে দেশে ফিরে যেতে চাইলেও উঠের পিঠে চ'ড়ে মরুভূমি পেরিয়ে পারস্যের ভিতর দিয়ে ফেরবার যখন উপায় নেই তখন ফিরতে হবে সেই সমুদ্রপথেই। আমরা অনেকেই কিন্তু ঠিক ক'রে ফেললুম মার্সেল্‌সে নেমে প্যারিসের পথে লন্ডন যাব।

আরব সাগরের পরে যখন লোহিত সাগরে পড়লুম তখন সমুদ্রপীড়া বাসি হয়ে গেছে। আফ্রিকা-আরবের মধ্যবর্তী এই হ্রদতুল্য সমুদ্রটি দুর্দান্ত নয়, জাহাজে থেকে থেকে জাহাজটার ওপর মায়াও পড়ে গেছে; তখন না মনে পড়ছে দেশকে, না ধারণা করতে পারা যাচ্ছে বিদেশকে; কোথা থেকে এসেছি ভুলে গেছি, কোথায় যাচ্ছি বুঝতে পারছিনে; তখন গতির আনন্দে কেবল ভেসে চলতেই ইচ্ছা করে, কোথাও থামবার বা নামবার সংকল্প দূর হয়ে যায়।

বিগত ও আগতের ভাবনা না ভেবে উপস্থিতের উপর দৃষ্টি ফেললুম—আপাতত আমাদের এই ভাসমান পান্থশালাটায় মন ন্যস্ত করলুম। খাওয়া -শোওয়া-খেলা-পড়া-গল্প করার যেমন বন্দোবস্ত যে-কোনো বড়ো হোটেলে থাকে এখানেও তেমনি, কেবল ক্যাবিনগুলো যা যথেষ্ট বড়ো নয়। ক্যাবিনে শুয়ে থেকে সিন্ধু-জননীর দোল খেয়ে মনে হয় খোকাদের মতো দোলনায় শুয়ে দুলছি। সমুদ্রপীড়া যেই সারল ক্যাবিনের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক অমনি কমলো। শোবার সময়টা ছাড়া বাকি সময়টা আমরা ডেকে কিংবা বসবার ঘরে কাটাতুম। ডেকে

চেয়ার ফেলে বসে কিংবা পায়চারি করতে করতে সমুদ্র দেখে দেখে চোখ শ্রান্ত হয়ে যায়; চারিদিকে জল আর জল, তাও নিস্তরঙ্গ, কেবল জাহাজের আশে পাশে ছাড়া ঢেউয়ের অস্তিত্ব নেই, যা আছে তা বাতাসের সোহাগ-চুম্বনে জলের হৃদয়-স্পন্দন। বসবার ঘরে অর্ধশায়িত থেকে খোশ গল্প করতে এর চেয়ে অনেক ভালো লাগে।

লোহিত সাগরের পরে ভূমধ্য সাগর, দুয়ের মাঝখানে যেন একটি সেতু ছিল, নাম সুয়েজ যোজক। এই যোজকের ঘটকালিতে এশিয়া এসে আফ্রিকার হাত ধরেছিল। সম্প্রতি হাতের জোড় খুলে দুই মহাদেশের মাঝখানে বিয়োগ ঘটিয়ে দেওয়া হয়েছে । যার দ্বারা তা ঘটল তার নাম সুয়েজ কেনাল। সুয়েজ কেনাল একদিকে বিচ্ছেদ ঘটাল বটে, কিন্তু অন্যদিকে মিলন ঘটাল—লোহিতের সঙ্গে ভূমধ্যের মিলন যেন ভারতের সঙ্গে ইউরোপের মিলন। কলম্বাস যা পারেননি, লেসেপ্‌স্‌ তা পারলেন। ভূমধ্য ও লোহিতের মধ্যে কয়েক শত মাইলের ব্যবধান, ঐটুকুর জন্যে ভূমধ্যের জাহাজকে লোহিতে আসতে বহু সহস্র মাইল ঘুরে আসতে হতো। মিশরের রাজারা কোন্‌ যুগ থেকে এর প্রতিকারের উপায় খুঁজছিলেন। উপায়টা দেখতে গেলে সুবোধ্য। ভূমধ্য ও লোহিতের মধ্যবর্তী ভুখণ্ডটাতে গোটাকয়েক হ্রদ চিরকালই আছে, এই হ্রদগুলোকে দুই সমুদ্রের সঙ্গে ও পরস্পরের সঙ্গে সংযুক্ত করে দিলেই সেই জলপথ দিয়ে এক সমুদ্রের জাহাজ অন্য সমুদ্রে যেতে পায়। কল্পনাটা অনেক কাল আগের, কিন্তু সেটা কার্যে পরিণত হতে হতে গত শতাব্দীর দুই তৃতীয়াংশ অতিবাহিত হয়ে গেল। কেনালটিতে কলাকুশলতা কী পরিমাণ আছে তা স্থপতিরাই জানেন, কিন্তু অব্যবসায়ী আমরা জানি—যাঁর প্রতিভার স্পর্শমণি লেগে একটা বিরাট কল্পনা একটা বিরাট কীর্তিতে রূপান্তরিত হলো সেই ফরাসি স্থপতি লেসেপ্‌স্‌ একজন বিশ্বকর্মা—তাঁর সৃষ্টি দূরকে নিকটে এনে মানুষের সঙ্গে মানুষের পরিচয় ঘনিষ্ঠতর করেছে। যান্ত্রিক সভ্যতার শত অপরাধ যাঁরা নিত্য স্মরণ করেন, এই ভেবে তারা একটি অপরাধ মার্জনা করুন।

সুয়েজ কেনাল আমাদের দেশের যে-কোনো ছোটো নদীর মতোই অপ্রশস্ত, এত বড়ো জোর দুখানা জাহাজ পাশাপাশি আসা যাওয়া করতে পারে, কিন্তু কেনাল যেখানে হ্রদে পড়েছে সেখানে এমন সংকীর্ণতা নেই। কেনালটির সুরু থেকে শেষ পর্যন্ত একটি দিকে নানান রকমের গাছ, যত্ন করে লাগানো, যত্ন করে রক্ষিত, অন্যদিকে ধু-ধু করা মাঠ, শ্যামলতার আভাসটুকুও নেই। কেনালের দুই দিকেই পাথরের পাহাড়, যেদিকে মিশর সেই দিকেই বেশি। এই পাহাড়গুলিতে যেন জাদু আছে, দেখলে মনে হয় যেন কোনো কিউবিস্ট এদের আপন খেয়ালমতো জ্যামিতিক আকার দিয়েছে আর এক-একটা পাহাড়কে এক-একটা পাথর কুঁদে গড়েছে।

কেনালটি যেখানে ভূমধ্যসাগরে পড়েছে সেখানে একটি শহর দাঁড়িয়ে গেছে, নাম পোর্ট সৈয়দ। জাহাজ থেকে নেমে শহরটায় বেরিয়ে আসা গেল। শহরটার বাড়িঘর ও রাস্তাঘাট ফরাসি প্রভাবের সাক্ষ্য দেয়। কাফেতে খাবার সময় ফুটপাথের ওপর বসে খেতে হয়, রাস্তায় চলবার সময় ডানদিক ধরে চলতে হয়। পোর্ট সৈয়দ হলো নানা জাতের নানা দেশের মোসাফেরদের তীর্থস্থল—কাজেই সেখানে তীর্থের কাকের সংখ্যা নেই, ফাঁক পেলে একজনের ট্যাঁকের টাকা আর একজনের ট্যাঁকে ওঠে।

পোর্ট সৈয়দ মিশরের অঙ্গ। মিশর প্রায় স্বাধীন দেশ। ইউরোপের এত কাছে বলে ও নানা জাতের পথিক-কেন্দ্র বলে মিশরীরা ইউরোপীয়দের সঙ্গে বেশি মিশতে পেরেছে, তাদের বেশি অনুকরণ করতে শিখেছে, তাদের দেশে অনায়াসে যাওয়া আসা করতে পারছে। ফলে ইউরোপীয়দের প্রতি তাদের অপরিচয়ের ভীতি বা অতিপরিচয়ের অবজ্ঞা নেই, ইউরোপের স্বাধীন মনোবৃত্তি তাদের সমাজে ও রাষ্ট্রে সঞ্চারিত হয়েছে।

পোর্ট সৈয়দ ছেড়ে আমরা ভূমধ্যসাগরে পড়লুম। শান্তশিষ্ট বলে ভূমধ্য সাগরের সুনাম আছে। প্রথম দিন-কতক চতুর ব্যবসাদারের মতো ভূমধ্যসাগর 'Honesty is the best policy' করলে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত ভদ্রতা রক্ষা করলে না। আর একবার করে কেউ কেউ শয্যাশায়ী হলেন। অধিকাংশকেই মার্সেল্‌সে নামতেই হলো। পোর্ট সৈয়দ থেকে মার্সেল্‌স পর্যন্ত জল ছাড়া ও দুটি দৃশ্য ছাড়া দেখবার আর কিছু নেই। প্রথমটি ইটালি ও সিসিলির মাঝখানে মেসিনা প্রণালী দিয়ে যাবার সময় দুই ধারের পাহাড়ের সারি। দ্বিতীয়, স্ট্রম্বোলি আগ্নেয়গিরি কাছ দিয়ে যাওয়ার সময় পাহাড়ের বুকে রাবণের চিতা।

মার্সেল্‌স্ ভূমধ্যসাগরের সেরা বন্দর ও ফরাসিদের দ্বিতীয় বড়ো শহর। ইতিহাসে এর নাম আছে, ফরাসিদের বন্দে মাতরম্ 'La Marseillaise'-এর এই নগরেই জন্ম। কাব্যে এ অঞ্চলের নাম আছে, ফরাসি সহজিয়া কবিদের (troubadour) প্রিয়ভূমি এই সেই Provence—বসন্ত যেখানে দীর্ঘস্থায়ী ও জ্যোৎস্না যেখানে স্বচ্ছ। এর পূর্ব দিকে সমুদ্রের কূলে কূলে ছোটো ছোটো অসংখ্য গ্রাম, সেই সব গ্রামে গ্রীষ্মযাপন করতে পৃথিবীর সব দেশের লোক আসে। Bandol নামক তেমনি একটি গ্রামে আমরা একটি দুপুর কাটালুম। মোটরে করে পাহাড়ের পর পাহাড় পেরিয়ে সেখানে যেতে হয়। পাহাড়ের ওপর থেকে মার্সেল্‌স্‌কে দেখলে মনে হয় যেন সমুদ্র তাকে সাপের মতো সাতপাক জড়িয়ে বেঁধেছে। মার্সেল্‌স্ শহরটাও পাহাড় কেটে তৈরি, ওর একটা রাস্তার সঙ্গে আরেকটা রাস্তা সমতল নয়, কোনো রাস্তায় ট্রামে করে যেতে যেতে ডানদিকে মোড় ফিরলে একেবারে রসাতল, কোনো রাস্তায় চলতে চলতে বাঁদিকে বেঁকে গেলে সামনে যেন স্বর্গের সিঁড়ি। মার্সেল্‌সের অনেক রাস্তার দুধারে গাছের সারি ও তার ওপারে ফুটপাথ।

মার্সেল্‌স্ থেকে প্যারিসের রেলপথে রাত কাটল। প্যারিস থেকে রেলপথে ক্যালে, ক্যালে থেকে জলপথে ডোভার এবং ডোভার থেকে রেলপথে লন্ডন।

(নির্বাচিত অংশ)

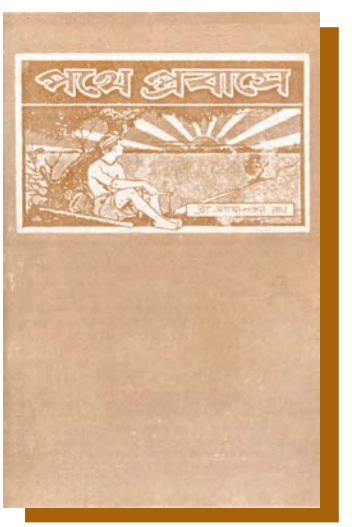

'পথে প্রবাসে'- বইটির প্রথম সংস্করণের প্রচ্ছদ।

ঘর

অমিয় চক্রবর্তী

বাড়ি ফিরেছি।
জারুলের বেড়া; কাঁকর পথ থামবে দরজায়;
আমার পৃথিবী
এইখানে শেষ।
অনেক দেশ
চোখের তৃষ্ণায় ঘিরেছি।
অনাত্ম সংসার দূরে গরজায়।
মনের স্মৃতির ঢিবি
আজ নেই।

নূতন হতেম প্রণামে
এই
আপন ঘরের গ্রামে।
বেড়া পার হল, পা, চলো।
সিঁড়ির কাছে চেনা কচি গলার আওয়াজ;
গাছের আড়ালে, বলো
কে স্থির দাঁড়িয়ে—
আলো নিয়ে।।
ফিরে-আসার সাঁঝ।।

হিমালয় দর্শন

বেগম রোকেয়া

যথা সময় যাত্রা করিয়া শিলিগুড়ি স্টেশনে আসিয়া পঁহুছিলাম। শিলিগুড়ি হইতে হিমালয় রেল রোড আরম্ভ হইয়াছে। ইস্ট ইন্ডিয়ান গাড়ির অপেক্ষা ইস্টার্ন বেঙ্গল রেলগাড়ি ছোটো, হিমালয়ান রেলগাড়ি আবার তাহার অপেক্ষাও ছোটো, ক্ষুদ্র গাড়িগুলি খেলনা গাড়ির মতো বেশ সুন্দর দেখায় । আর গাড়িগুলি খুব নীচু।—যাত্রীগণ ইচ্ছা করিলে চলিবার সময়ও অনায়াসে উঠিতে নামিতে পারেন।

আমাদের ট্রেন অনেক আঁকাবাঁকা পথ অতিক্রম করিয়া ধীরে ধীরে উপরে উঠিতে লাগিল—গাড়িগুলি 'কটাটটা'—শব্দ করিতে করিতে কখনও দক্ষিণে কখনও উত্তরে আঁকিয়া বাঁকিয়া চলিল। পথের দুই ধারে মনোরম দৃশ্য—কোথাও অতি উচ্চ (step) চূড়া, কোথাও নিবিড় অরণ্য।

ক্রমে আমরা সমুদ্র (sea level) হইতে তিন হাজার ফিট উচ্চে উঠিয়াছি, এখনও শীত বোধ হয় না, কিন্তু মেঘের ভেতর দিয়া চলিয়াছি। নিম্ন উপত্যকায় নির্মল শ্বেত কুজ্ঝটিকা দেখিয়া সহসা নদী বলিয়া ভ্রম জন্মে। তরু, লতা, ঘাস, পাতা—সকলই মনোহর। এত বড়ো বড়ো ঘাস আমি পূর্বে দেখি নাই। হরিদ্বর্ণ চায়ের ক্ষেত্রগুলি প্রাকৃতিক শোভা আরও শতগুণ বৃদ্ধি করিয়াছে। দূর হইতে সারি সারি চারাগুলি বড়ো সুন্দর বোধ হয়। মাঝে মাঝে মানুষের চলিবার সংকীর্ণ পথগুলি ধরণীর সীমন্তের ন্যায় দেখায়! নিবিড় শ্যামল বন বসুমতীর ঘন কেশপাশ, আর পথগুলি আঁকা বাঁকা সিঁথি!

রেলপথে অনেকগুলি জলপ্রপাত বা নির্ঝর দৃষ্টিগোচর হইল—ইহার সৌন্দর্য বর্ণনাতীত। কোথা হইতে আসিয়া ভীমবেগে হিমাদ্রির পাষাণ হৃদয় বিদীর্ণ করিতে করিতে ইহারা কোথায় চলিয়াছে! ইহাদেরই কোন একটি বিশালকায় জাহ্নবীর উৎস, একথা সহসা বিশ্বাস হয় কি? একটি বড়ো ঝরনার নিকট ট্রেন থামিল, আমরা ভাবিলাম, যাহাতে আমরা প্রাণ ভরিয়া জলপ্রবাহ দেখিতে পাই, সেই জন্য বোধহয় গাড়ি থামিয়াছে। (বাস্তবিক সেজন্য কিন্তু ট্রেন থামে নাই—অন্য কারণ ছিল। সেইখানে জল পরিবর্তন করা হইতেছিল।) যে কারণেই ট্রেন থামুক—আমাদের মনোরথ পূর্ণ হইল।

এখন আমরা চারি হাজার ফিট ঊর্ধ্বে উঠিয়াছি, তবু শীত অনুভব করি না, কিন্তু গরমের জ্বালায় যে এতক্ষণ প্রাণ কণ্ঠাগত ছিল—সে জুলুম হইতে রক্ষা পাইলাম। অল্প অল্প বাতাস মৃদু গতিতে বহিতেছে।

অবশেষে কারসিয়ং স্টেশনে উপস্থিত হইলাম, এখানকার উচ্চতা ৪৮৬৪ ফিট।

স্টেশন হইতে আমাদের বাসা অধিক দূর নহে, শীঘ্রই আসিয়া পঁহুছিলাম। আমাদের ট্রাঙ্ক কয়টা ভ্রমক্রমে দার্জিলিঙের ঠিকানায় book করা হইয়াছিল। জিনিসপত্রের অভাবে বাসায় আসিয়াও (সন্ধ্যার পূর্বে) গৃহসুখ (at home) অনুভব করিতে পারি নাই! সন্ধ্যার ট্রেনে আমাদের ট্রাঙ্কগুলি ফিরিয়া আসিল। আমাদের দার্জিলিং যাইবার পূর্বে আমাদের জিনিসপত্র তথাকার বায়ু সেবন করিয়া চরিতার্থ হইল! পরদিন হইতে আমরা সম্পূর্ণ গৃহসুখে আছি। তাই বলি, কেবল আশ্রয় পাইলে সুখে গৃহে থাকা হয় না, আবশ্যকীয় আসবাব সরঞ্জামও চাই।

এখানে এখনও শীতের বৃদ্ধি হয় নাই, গ্রীষ্মও নাই। এ সময়কে পার্বত্য বসন্তকাল বলিলে কেমন হয়? সূর্যকিরণ প্রখর বোধ হয়। আমাদের আসিবার পর একদিন মাত্র সামান্য বৃষ্টি হইয়াছিল। বায়ু তো খুবই স্বাস্থ্যকর, জল নাকি খুব ভালো নহে। আমরা পানীয় জল ফিলটারে ছাঁকিয়া ব্যবহার করি। জল কিন্তু দেখিতে খুব পরিষ্কার স্বচ্ছ। কূপ নাই, নদী পুষ্করিণীও নাই—সবে ধন নির্ঝরের জল। ঝরনার সুবিমল, সুশীতল জলদর্শনে চক্ষু জুড়ায়, স্পর্শনে হস্ত জুড়ায় এবং ইহার চতুষ্পার্শ্বস্থিত শীতল বাতাসে, না, ঘন কুয়াশায় প্রাণ জুড়ায়!

এখানকার বায়ু পরিষ্কার ও হালকা। বায়ু এবং মেঘের লুকোচুরি খেলা দেখিতে চমৎকার! এই মেঘ এদিকে আছে, ওদিক হইতে বাতাস আসিল,—মেঘখণ্ডকে তাড়াইয়া লইয়া চলিল। প্রতিদিন অস্তমান রবি বায়ু এবং মেঘ লইয়া মনোহর সৌন্দর্যের রাজ্য রচনা করে। পশ্চিম গগনে পাহাড়ের গায়ে তরল স্বর্ণ ঢালিয়া দেওয়া হয়। অতঃপর খণ্ড খণ্ড সুকুমার মেঘগুলি সুকোমল অঙ্গে সুবর্ণ মাখিয়া বায়ুভরে ইতস্তত ছুটাছুটি করিতে থাকে। ইহাদের এই তামাশা দেখিতেই আমার সময় অতিবাহিত হয়, আত্মহারা হইয়া থাকি, আমি কোনো কাজ করিতে পারি না।

মনে পড়ে একবার 'মহিলা'য় ঢেঁকির শাকের কথা পাঠ করিয়াছি। ঢেঁকি শাককে আমি ক্ষুদ্র গুল্ম বলিয়াই জানিতাম। কেবল ভূ-তত্ত্ব (Geology) গ্রন্থে পাঠ করিয়াছিলাম যে, কারবনিফেরাস যুগে বড় বড় ঢেঁকিতরু ছিল। এখন সেই ঢেঁকিতরু স্বচক্ষে দেখিলাম—ভারী আনন্দ হইল। তরুবর ২০/২৫ ফিট উচ্চ হইবে।

কোনো কোনো স্থানে খুব নিবিড় বন। সুখের বিষয় বাঘ নাই, তাই নির্ভয়ে বেড়াইতে পারি, আমরা নির্জন বন্য পথেই বেড়াইতে ভালোবাসি। সর্প এবং ছিনে জোঁক আছে। এ পর্যন্ত সর্পের সহিত আমাদের সাক্ষাৎ হয় নাই। কেবল দুই তিন বার জোঁকে রক্ত শোষণ করিয়াছে।

এদেশের স্ত্রীলোকেরা জোঁক দেখিলে ভয় পায় না। আমাদের ভুটিয়া চাকরানি 'ভালু' বলে, 'জোঁকে কি ক্ষতি করে? রক্ত শোষণ শেষ হইলে আপনিই চলিয়া যায়। ভুটিয়ানিরা সাত গজ লম্বা কাপড় ঘাঘরার মতো করিয়া

পরে, কোমরে একখণ্ড কাপড় জড়ানো থাকে, গায়ে জ্যাকেট এবং বিলাতি শাল দ্বারা মাথা ঢাকে, পৃষ্ঠে দুই এক মন বোঝা লইয়া অনায়াসে প্রস্তর-সঙ্কুল আবুড়াখাবুড়া পথ বহিয়া উচ্চে উঠে; ঐরূপ নীচেও যায়! যে পথ দেখিয়াই আমাদের সাহস 'গায়েব' হয়—সেই পথে উহারা বোঝা লইয়া অবলীলাক্রমে উঠে।

মহিলার সম্পাদক মহাশয় আমাদের সম্বন্ধে একবার লিখিয়াছিলেন যে, 'রমণীজাতি দুর্বল বলিয়া তাঁহাদের নাম অবলা'। জিজ্ঞাসা করি, এই ভুটিয়ানিরাও ঐ অবলা জাতির অন্তর্গত না কি? ইহারা উদরান্নের জন্য পুরুষদের প্রত্যাশী নহে; সমভাবে উপার্জন করে। বরং অধিকাংশ স্ত্রীলোকদিগকেই পাথর বহিতে দেখি—পুরুষেরা বেশি বোঝা বহন করে না। অবলারা প্রস্তর বহিয়া লইয়া যায়। সবলেরা পথে পাথর বিছাইয়া রাস্তা প্রস্তুত করে, সে কাজে বালক বালিকরাও যোগদান করে। এখানে সবলেরা বালক বালিকার দলভুক্ত বলিয়া বোধ হয়।

ভুটিয়ানিরা 'পাহাড়নি' বলিয়া আপন পরিচয় দেয়, এবং আমাদিগকে 'নীচেকা আদমি' বলে! যেন ইহাদের মতে 'নীচেকা আদমি'-ই অসভ্য! স্বভাবত ইহারা শ্রমশীলা, কার্যপ্রিয়, সাহসী ও সত্যবাদী। কিন্তু 'নীচেকা আদমি'র সংস্রবে থাকিয়া ইহারা ক্রমশ সদ্‌গুণরাজি হারাইতেছে। বাজারের পয়সা অল্পস্বল্প চুরি করা, দুধে জল মিশানো ইত্যাদি দোষ শিখিতেছে। আবার 'নীচেকা আদমি'র সঙ্গে বিবাহও হয়! ঐরূপে উহারা অন্যান্য জাতির সহিত মিশিতেছে।

আমাদের বাসা হইতে প্রায় এক মাইল দূরে বড়ো একটা ঝরনা বহিতেছে; এখান হইতে ঐ দুগ্ধফেননিভ জলের স্রোত দেখা যায়। দিবানিশি তাহার কল্লোল গীতি শুনিয়া ঈশ্বরের প্রতি ভক্তির উচ্ছ্বাস দ্বিগুণ ত্রিগুণ বেগে প্রবাহিত হয়। বলি, প্রাণটাও কেন ঐ নির্ঝরের ন্যায় বহিয়া গিয়া পরমেশ্বরের চরণপ্রান্তে লুটাইয়া পড়ে না?

অধিক কী বলিব, আমি পাহাড়ে আসিয়া অত্যন্ত সুখী এবং ঈশ্বরের নিকট কৃতজ্ঞ হইয়াছি। সমুদ্রের সামান্য নমুনা, অর্থাৎ বঙ্গোপসাগর দেখিয়াছি, বাকি ছিল পর্বতের একটি নমুনা দেখা। এখন সে সাধও পূর্ণ হইল।

না, সাধ তো মিটে নাই! যত দেখি, ততই দর্শন পিপাসা শতগুণ বাড়ে! কিন্তু কেবল দুইটি চক্ষু দিয়াছেন, তাহা দ্বারা কত দেখিব? প্রভু অনেকগুলি চক্ষু দেন নাই কেন? যত দেখি, যত ভাবি, তাহা ভাষায় ব্যক্ত করিবার ক্ষমতা নাই। প্রত্যেকটি উচ্চশৃঙ্গ, প্রত্যেকটি ঝরনা প্রথমে যেন বলে, আমায় দেখ! আমায় দেখ! যখন তাহাকে বিস্ময়-বিস্ফারিত নয়নে দেখি, তখন তাহারা ঈষৎ হাস্যে ভ্রূকুটি করিয়া বলে, আমাকে কী দেখ? আমার স্রষ্টাকে স্মরণ করো! ঠিক কথা। চিত্র দেখিয়া চিত্রকরের নৈপুণ্য বুঝা যায়। নতুবা নাম শুনিয়া কে কাহাকে চিনে? আমাদের জন্য হিমালয়ের এই পাদদেশটুকু কত বৃহৎ, কত বিস্তৃত—কী মহান! আর সেই মহাশিল্পীর সৃষ্ট জগতে হিমালয় কত ক্ষুদ্র! বালুকাকণা বলিলেও বড়ো বলা হয়!

আমাদের এমন সুন্দর চক্ষু, কর্ণ, মন লইয়া যদি আমরা স্রষ্টার গুণকীর্তন না করি, তবে কি কৃতঘ্নতা হয় না? মন, মস্তিষ্ক, প্রাণ সব লইয়া উপাসনা করিলে, তবে তৃপ্তি হয়। কেবল টিয়াপাখির মতো কণ্ঠস্থ কতকগুলি শব্দ উচ্চারণ করিলে (অন্তত আমার মতে) উপাসনা হয় না। তদ্রূপ উপাসনায় প্রাণের আবেগ থাকে কই? প্রাকৃতিক সৌন্দর্য দর্শনকালে মন প্রাণ স্বতঃই সমস্বরে বলিয়া উঠে, 'ঈশ্বরই প্রশংসার যোগ্য। তিনিই ধন্য!' তখন এসব কথা মুখে উচ্চারণের প্রয়োজনও হয় না।

(সংক্ষেপিত ও সম্পাদিত)

নোঙর

অজিত দত্ত

পাড়ি দিতে দূর সিন্ধুপারে
নোঙর গিয়েছে পড়ে তটের কিনারে।
সারারাত মিছে দাঁড় টানি,
মিছে দাঁড় টানি।
জোয়ারের ঢেউগুলি ফুলে ফুলে ওঠে,
এ-তরীতে মাথা ঠুকে সমুদ্রের দিকে তারা ছোটে।
তারপর ভাঁটার শোষণ
স্রোতের প্রবল প্রাণ করে আহরণ।
জোয়ার-ভাঁটায় বাঁধা এ-তটের কাছে
আমার বাণিজ্য-তরী বাঁধা পড়ে আছে।
যতই না দাঁড় টানি, যতই মাস্তুলে বাঁধি পাল,
নোঙরের কাছি বাঁধা তবু এ নৌকা চিরকাল।
নিস্তব্ধ মুহূর্তগুলি সাগরগর্জনে ওঠে কেঁপে,
স্রোতের বিদ্রুপ শুনি প্রতিবার দাঁড়ের নিক্ষেপে।
যতই তারার দিকে চেয়ে করি দিকের নিশানা
ততই বিরামহীন এই দাঁড় টানা।

তরী ভরা পণ্য নিয়ে পাড়ি দিতে সপ্তসিন্ধুপারে,
নোঙর কখন জানি পড়ে গেছে তটের কিনারে।
সারারাত তবু দাঁড় টানি,
তবু দাঁড় টানি।।

চতুর্থ পাঠ

পালামৌ

সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

সেকালের হরকরা নামক ইংরেজি পত্রিকায় দেখিতাম, কোনো একজন মিলিটারি সাহেব 'পেরেড' বৃত্তান্ত, 'ব্যান্ডেল' বাদ্যচর্চা প্রভৃতি নানা কথা পালামৌ হইতে লিখিতেন। আমি তখন ভাবিতাম, পালামৌ প্রবল শহর, সাহেবসমাকীর্ণ সুখের স্থান। তখন জানিতাম না যে, পালামৌ শহর নহে, একটি প্রকাণ্ড পরগনামাত্র। শহর সে অঞ্চলেই নাই, নগর দূরে থাকুক, তথায় একখানি গণ্ডগ্রামও নাই, কেবল পাহাড় ও জঙ্গলে পরিপূর্ণ।

পাহাড় আর জঙ্গল বলিলে কে কী অনুভব করেন বলিতে পারি না। যাঁহারা 'কৃষ্ণচন্দ্র কর্মকার কৃত' পাহাড় দেখিয়াছেন, আর যাঁহাদের গৃহপার্শ্বে শৃগালশ্রান্তি-সংবাহক ভাটভেরান্ডার জঙ্গল আছে, তাঁহারা যে এ কথা সমগ্র অনুভব করিয়া লইবেন, ইহার আর সন্দেহ নাই। কিন্তু অন্য পাঠকের জন্য সেই পাহাড় জঙ্গলের কথা কিঞ্চিৎ উত্থাপন করা আবশ্যক। সকলের অনুভবশক্তি তো সমান নহে।

রাঁচি হইতে পালামৌ যাইতে যাইতে যখন বাহকগণের নির্দেশমতো দূর হইতে পালামৌ দেখিতে পাইলাম, তখন আমার বোধ হইল যেন মর্ত্যে মেঘ করিয়াছে। আমি অনেকক্ষণ দাঁড়াইয়া সেই মনোহর দৃশ্য দেখিতে লাগিলাম। ঐ অন্ধকার মেঘমধ্যে এখনই যাইব, এই মনে করিয়া আমার কতই আহ্লাদ হইতে লাগিল। কতক্ষণে পৌঁছিব মনে করিয়া আবার কতই ব্যস্ত হইলাম।

পরে চারি পাঁচ ক্রোশ অগ্রসর হইয়া আবার পালামৌ দেখিবার নিমিত্ত পালকি হইতে অবতরণ করিলাম। তখন আর মেঘভ্রম হইল না, পাহাড়গুলি স্পষ্ট চেনা যাইতে লাগিল; কিন্তু জঙ্গল ভালো চেনা গেল না। তাহার পর আরও দুই এক ক্রোশ অগ্রসর হইলে, তাম্রাভ অরণ্য চারি দিকে দেখা যাইতে লাগিল।... শেষ আরও কতক দূর গেলে বন স্পষ্ট দেখা গেল। পাহাড়ের গায়ে, নিম্নে, সর্বত্র জঙ্গল, কোথাও আর ছেদ নাই। কোথাও কর্ষিত ক্ষেত্র নাই, গ্রাম নাই, নদী নাই, পথ নাই, কেবল বন—ঘন নিবিড় বন।

পরে পালামৌ প্রবেশ করিয়া দেখিলাম, নদী, গ্রাম, সকলই আছে, দূর হইতে তাহা কিছুই দেখা যায় না। পালামৌ পরগনায় পাহাড় অসংখ্য, পাহাড়ের পর পাহাড়, তাহার পর পাহাড়, আবার পাহাড়; যেন বিচলিত নদীর সংখ্যাতীত তরঙ্গ। আবার বোধ হয় যেন অবনীর অন্তরাগ্নি একদিনেই সেই তরঙ্গ তুলিয়াছিল। এখন আমার ঠিক স্মরণ হয় না, কিন্তু বোধ হয় যেন দেখিয়াছিলাম, সকল তরঙ্গগুলি পূর্ব দিক হইতে উঠিয়াছিল, কোনো কোনোটি পূর্ব দিক হইতে উঠিয়া পশ্চিম দিকে নামে নাই। এইরূপ অর্ধপাহাড় লাতেহার গ্রামপার্শ্বে একটি আছে, আমি প্রায় নিত্য তথায় গিয়া বসিয়া থাকিতাম। এই পাহাড়ের পশ্চিম ভাগে মৃত্তিকা নাই। সুতরাং তাহার অন্তরস্থ সকল স্তর দেখা যায়, এক স্তরে নুড়ি, আর এক স্তরে কাল পাথর, ইত্যাদি। কিন্তু কোনো স্তরই সমসূত্র নহে, প্রত্যেকটি কোথাও উঠিয়াছে, কোথায়ও নামিয়াছে। আমি তাহা পূর্বে লক্ষ করি নাই, লক্ষ করিবার কারণ পরে ঘটিয়াছিল। একদিন অপরাহ্ণে এই পাহাড়ের মূলে দাঁড়াইয়া আছি, এমত সময় আমার একটা নেমোকহারাম ফরাসিস কুক্কুর (poodle) আপন ইচ্ছামতো তাঁবুতে চলিয়া গেল, আমি রাগত হইয়া চিৎকার করিয়া তাহাকে ডাকিলাম। আমার পশ্চাতে সেই চিৎকার অত্যাশ্চর্যরূপে প্রতিধ্বনিত হইল। পশ্চাৎ ফিরিয়া পাহাড়ের প্রতি চাহিয়া আবার চিৎকার করিলাম, প্রতিধ্বনি আবার পূর্বমত হ্রস্ব দীর্ঘ হইতে হইতে পাহাড়ের অপর প্রান্তে চলিয়া গেল। আবার চিৎকার করিলাম, শব্দ পূর্ববৎ পাহাড়ের গায়ে লাগিয়া উচ্চ নীচ হইতে লাগিল। এইবার বুঝিলাম, শব্দ কোনো একটি বিশেষ স্তর অবলম্বন করিয়া যায়; সেই স্তর যেখানে উঠিয়াছে বা নামিয়াছে, শব্দও সেখানে উঠিতে নামিতে থাকে। কিন্তু শব্দ দীর্ঘকাল কেন স্থায়ী হয়, যত দূর পর্যন্ত সেই স্তরটি

আছে, তত দূর পর্যন্ত কেন যায়, তাহা কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। ঠিক যেন সেই স্তরটি শব্দ কন্ডাক্টর (conductor); যে পর্যন্ত ননকন্ডাক্টরের সঙ্গে সংস্পর্শ না হয়, সে পর্যন্ত শব্দ ছুটিতে থাকে।

আর একটি পাহাড় দেখিয়া চমৎকৃত হইয়াছিলাম। সেটি একশিলা, সমুদয়ে একখানি প্রস্তর। তাহাতে একেবারে কোথাও কণামাত্র মৃত্তিকা নাই, সমুদয় পরিষ্কার ঝর্‌ঝর্‌ করিতেছে। তাহার এক স্থান অনেক দূর পর্যন্ত ফাটিয়া গিয়াছে, সেই ফাটার উপর বৃহৎ এক অশ্বত্থগাছ জন্মিয়াছে। তখন মনে হইয়াছিল, অশ্বত্থবৃক্ষ বড়ো রসিক, এই নীরস পাষাণ হইতেও রস গ্রহণ করিতেছে। কিছুকাল পরে আর একদিন এই অশ্বত্থগাছ আমার মনে পড়িয়াছিল, তখন ভাবিয়াছিলাম, বৃক্ষটি বড়ো শোষক, ইহার নিকট নীরস পাষাণেরও নিস্তার নাই। এখন বোধ হয় অশ্বত্থগাছটি আপন অবস্থানুরূপ কার্য করিতেছে; সকল বৃক্ষই যে বাংলার রসপূর্ণ কোমল ভূমিতে জন্মগ্রহণ করিয়া বিনা কষ্টে কাল যাপন করিবে, এমন সম্ভব নহে। যাহার ভাগ্যে কঠিন পাষাণ, পাষাণই তাহার অবলম্বন। এখন আমি অশ্বত্থটির প্রশংসা করি।

এক্ষণে সে সকল কথা যাউক, প্রথম দিনের কথা দুই একটি বলি। অপরাহ্ণে পালামৌয়ে প্রবেশ করিয়া উভয়পার্শ্বস্থ পর্বতশ্রেণি দেখিতে দেখিতে বনমধ্য দিয়া যাইতে লাগিলাম। বাঁধা পথ নাই, কেবল এক সংকীর্ণ গো-পথ দিয়া আমার পালকি চলিতে লাগিল, অনেক স্থলে উভয়পার্শ্বস্থ লতা পল্লব পালকি স্পর্শ করিতে লাগিল। বনবর্ণনায় যেরূপ ''শাল তাল তমাল হিন্তাল'' শুনিয়াছিলাম, সেরূপ কিছুই দেখিতে পাইলাম না। তাল হিন্তাল একেবারেই নাই, কেবল শালবন, অন্য বন্য গাছও আছে। শালের মধ্যে প্রকাণ্ড গাছ একটিও নাই, সকলগুলিই আমাদের দেশি কদম্ববৃক্ষের মতো, না হয় কিছু বড়ো, কিন্তু তাহা হইলেও জঙ্গল অতি দুর্গম, কোথাও তাহার ছেদ নাই, এই জন্য ভয়ানক। মধ্যে মধ্যে যে ছেদ আছে, তাহা অতি সামান্য। এইরূপ বন দিয়া যাইতে যাইতে এক স্থানে হঠাৎ কাষ্ঠঘণ্টার বিষণ্ণকর শব্দ কর্ণগোচর হইল, কাষ্ঠঘণ্টা পূর্বে মেদিনীপুর অঞ্চলে দেখিয়াছিলাম। গৃহপালিত পশু বনে পথ হারাইলে, শব্দানুসরণ করিয়া তাহাদের অনুসন্ধান করিতে হয়; এই জন্য গলঘণ্টার উৎপত্তি। কাষ্ঠঘণ্টার শব্দ শুনিলে প্রাণের ভিতর কেমন করে। পাহাড় জঙ্গলের মধ্যে সে শব্দে আরও যেন অবসন্ন করে; কিন্তু সকলকে করে কি না তাহা বলিতে পারি না।

পরে দেখিলাম, একটি মহিষ সভয়ে মুখ তুলিয়া আমার পালকির প্রতি একদৃষ্টিতে চাহিয়া আছে, তাহার গলায় কাষ্ঠঘণ্টা ঝুলিতেছে। আমি ভাবিলাম, পালিত মহিষ যখন নিকটে, তখন গ্রাম আর দূরে নহে। অল্প বিলম্বেই অর্ধশুষ্ক তৃণাবৃত একটি ক্ষুদ্র প্রান্তর দেখা গেল, এখানে সেখানে দুই একটি মধু বা মৌয়াবৃক্ষ ভিন্ন সে প্রান্তরে গুল্ম কি লতা কিছুই নাই, সর্বত্র অতি পরিষ্কার। পর্বতচ্ছায়ায় সে প্রান্তর আরও রম্য হইয়াছে; তথায় কতকগুলি কোলবালক একত্র মহিষ চরাইতেছিল, সেরূপ কৃষ্ণবর্ণ কান্তি আর কখনও দেখি নাই; সকলের গলায় পুঁতির সাতনরী, ধুকধুকির পরিবর্তে এক একখানি গোল আরসি; পরিধানে ধড়া; কর্ণে বনফুল, কেহ মহিষপৃষ্ঠে শয়ন করিয়া আছে; কেহ বা মহিষপৃষ্ঠে বসিয়া আছে; কেহ কেহ নৃত্য করিতেছে। সকলগুলিই যেন কৃষ্ণঠাকুর বলিয়া বোধ হইতে লাগিল।...

(সংক্ষেপিত ও সম্পাদিত)

খেয়া

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

খেয়ানৌকা পারাপার করে নদীস্রোতে;
কেহ যায় ঘরে, কেহ আসে ঘর হতে।
দুই তীরে দুই গ্রাম আছে জানাশোনা,
সকাল হইতে সন্ধ্যা করে আনাগোনা।
পৃথিবীতে কত দ্বন্দ্ব, কত সর্বনাশ,
নূতন নূতন কত গড়ে ইতিহাস–
রক্তপ্রবাহের মাঝে ফেনাইয়া উঠে
সোনার মুকুট কত ফুটে আর টুটে!
সভ্যতার নব নব কত তৃষ্ণা ক্ষুধা–
উঠে কত হলাহল, উঠে কত সুধা!
শুধু হেথা দুই তীরে, কেবা জানে নাম,
দোঁহা-পানে চেয়ে আছে দুইখানি গ্রাম।
এই খেয়া চিরদিন চলে নদীস্রোতে–
কেহ যায় ঘরে, কেহ আসে ঘর হতে।।

আকাশে সাতটি তারা

জীবনানন্দ দাশ

আকাশে সাতটি তারা যখন উঠেছে ফুটে আমি এই ঘাসে
বসে থাকি; কামরাঙা-লাল মেঘ যেন মৃত মনিয়ার মতো
গঙ্গাসাগরের ঢেউয়ে ডুবে গেছে—আসিয়াছে শান্ত অনুগত
বাংলার নীল সন্ধ্যা—কেশবতী কন্যা যেন এসেছে আকাশে;
আমার চোখের 'পরে আমার মুখের 'পরে চুল তার ভাসে;
পৃথিবীর কোনো পথ এ কন্যারে দেখে নি কো—দেখি নাই অত
অজস্র চুলের চুমা হিজলে কাঁঠালে জামে ঝরে অবিরত,
জানি নাই এত স্নিগ্ধ গন্ধ ঝরে রূপসীর চুলের বিন্যাসে

পৃথিবীর কোনো পথে : নরম ধানের গন্ধ—কলমীর ঘ্রাণ,
হাঁসের পালক, শর, পুকুরের জল, চাঁদা-সরপুঁটিদের
মৃদু ঘ্রাণ, কিশোরীর চালধোয়া ভিজে হাত—শীত হাতখান,
কিশোরের পায়ে-দলা মুথাঘাস—লাল লাল বটের ফলের
ব্যথিত গন্ধের ক্লান্ত নীরবতা—এরই মাঝে বাংলার প্রাণ;
আকাশে সাতটি তারা যখন উঠেছে ফুটে আমি পাই টের।

বর্ষা

প্রমথ চৌধুরী

এমন দিনে কি লিখতে মন যায়?

আজ সকালে ঘুম থেকে উঠে দেখি যে, যে দিকে যতদূর দৃষ্টি যায় সমগ্র আকাশ বর্ষায় ভরে গিয়েছে। মাথার উপর থেকে অবিরাম অবিরল অবিচ্ছিন্ন বৃষ্টির ধারা পড়ছে। সে ধারা এত সূক্ষ্ম নয় যে চোখ এড়িয়ে যায়, অথচ এত স্থূলও নয় যে তা চোখ জুড়ে থাকে। আর কানে আসছে তার একটানা আওয়াজ; সে আওয়াজ কখনও মনে হয় নদীর কুলুধ্বনি, কখনও মনে হয় তা পাতার মর্মর। আসলে তা একসঙ্গে ও দুই-ই; কেননা আজকের দিনে জলের স্বর ও বাতাসের স্বর দুই মিলে-মিশে এক সুর হয়ে দাঁড়িয়েছে।

এমন দিনে মানুষ যে অন্যমনস্ক হয় তার কারণ তার সকল মন তার চোখ আর কানে এসে ভর করে। আমাদের এই চোখ-পোড়ানো আলোর দেশে বর্ষার আকাশ আমাদের চোখে কী যে অপূর্ব স্নিগ্ধ প্রলেপ মাখিয়ে দেয় তা বাঙালি মাত্রেই জানে। আজকের আকাশ দেখে মনে হয়, ছায়ার রঙের কোনো পাখির পালক দিয়ে বর্ষা তাকে আগাগোড়া মুড়িয়ে দিয়েছে, তাই তার স্পর্শ আমাদের চোখের কাছে এত নরম, এত মোলায়েম।

তারপর চেয়ে দেখি গাছপালা মাঠঘাট সবারই ভিতর যেন একটা নূতন প্রাণের হিল্লোল বয়ে যাচ্ছে। সে প্রাণের আনন্দে নারকেল গাছগুলো সব দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দুলছে, আর তাদের মাথার ঝাঁকড়া চুল কখনও-বা এলিয়ে পড়ছে, কখনও-বা জড়িয়ে যাচ্ছে। আর পাতার চাপে যেসব গাছের ডাল দেখা যায় না, সেসব গাছের পাতার দল এ ওর গায়ে ঢলে পড়ছে, পরস্পর কোলাকুলি করছে; কখনও-বা বাতাসের স্পর্শে বেঁকে-চুরে এমন আকার ধারণ করছে যে দেখলে মনে হয় বৃক্ষলতা সব পত্রপুটে ফটিকজল পান করছে। আর এই খামখেয়ালি বাতাস নিজের খুশিমতো একবার পাঁচ মিনিটের জন্য লতাপাতাকে নাচিয়ে দিয়ে বৃষ্টির ধারাকে ছড়িয়ে দিয়ে আবার থেমে যাচ্ছে। তারপর আবার সে ফিরে এসে যা ক্ষণকালের জন্য স্থির ছিল তাকে আবার ছুঁয়ে দিয়ে পালিয়ে যাচ্ছে, সে যেন জানে যে তার স্পর্শে যা-কিছু জীবন্ত অথচ শান্ত সে সবই প্রথমে কেঁপে উঠবে, তার পর ব্যতিব্যস্ত হবে, তারপর মাথা নাড়বে, তারপর হাত-পা ছুঁড়বে; আর জলের গায়ে ফুটবে পুলক আর তার মুখে শীৎকার। বৃষ্টির সঙ্গে বৃক্ষপল্লবের সঙ্গে সমীরণের এই লুকোচুরি খেলা আমি চোখ ভরে দেখছি আর কান পেতে পেতে শুনছি। মনের ভিতর আমার এখন আর কোনো ভাবনাচিন্তা নেই, আছে শুধু এমন-একটা অনুভূতি যার কোনো স্পষ্ট রূপ নেই, কোনো নির্দিষ্ট নাম নেই।

মনের এমন বিক্ষিপ্ত অবস্থায় কি লেখা যায়? যদি যায় তো সে কবিতা, প্রবন্ধ নয়।

আনন্দে-বিষাদে মেশানো ওই অনামিক অনুভূতির জমির উপর অনেক ছোটোখাটো ভাব মুহূর্তের জন্য ফুটে উঠছে আবার মুহূর্তেই তা মিলিয়ে যাচ্ছে। এই বর্ষার দিনে কত গানের সুর আমার কানের কাছে গুনগুন করছে, কত কবিতার শ্লোক, কখনও পুরোপুরি কখনও আধখানা হয়ে, আমার মনের ভিতর ঘুরে বেড়াচ্ছে। আজকে আমি ইংরেজি ভুলে গিয়েছি। যেসব কবিতা যেসব গান আজ আমার মনে পড়ছে সে সবই হয় সংস্কৃত, নয় বাংলা, নয় হিন্দি।

মেঘৈর্মেদুরম্বরং বনভুবশ্যামাস্তমালদ্রুমৈঃ

গীতগোবিন্দের এই প্রথম চরণ যে বাঙালি একবার শুনেছে চিরজীবন সে আর তা ভুলতে পারবে না। আকাশে ঘনঘটা হলেই তার কানে ও-চরণ আপনা হতেই বাজতে থাকবে। সেইসঙ্গে মনে পড়ে যাবে মনের কত পুরোনো কথা, কত লুকানো ব্যথা। আমি ভাবছি মানুষ ভাষায় তার মনের কথা কত অল্প ব্যক্ত করে, আর কত বেশি অব্যক্ত রয়ে যায়। ভাষায় মনোভাব ব্যক্ত করবার জন্যই যাঁরা এ পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করেছেন তাঁরাও, অর্থাৎ কবির দলও, আমার বিশ্বাস, তাঁদের মনকে অর্ধেক প্রকাশ করেছেন, অর্ধেক গোপন রেখেছেন। আজকের দিনে রবীন্দ্রনাথের একটি পুরোনো গানের প্রথম ছত্রটি ঘুরে ফিরে ক্রমান্বয়ে আমার কানে আসছে—'এমন দিনে তারে বলা যায়'। এমন দিনে যা বলা যায় তা হয়তো রবীন্দ্রনাথও আজ পর্যন্ত বলেননি, শেক্‌স্‌পিয়রও বলেননি। বলেন যে নি, সে ভালোই করেছেন। কবি যা ব্যক্ত করেন তার ভিতর যদি এই অব্যক্তের ইঙ্গিত না থাকে তা হলে তাঁর কবিতার ভিতর কোনো mystery থাকে না, আর যে কথার ভিতর mystery নেই, তা কবিতা নয়—পদ্য হতে পারে।

সে যাই হোক, আজ আমার কানে শুধু রবীন্দ্রনাথের গানের সুর লেগে নেই, সেইসঙ্গে তিনি বর্ষার যে অসংখ্য ছবি এঁকেছেন সেইসব চিত্র বায়োস্কোপের ছবির মতো আমার চোখের সুমুখ দিয়ে একটির পর আর-একটি চলে যাচ্ছে। ভালো কথা—এটা কখনও ভেবে দেখেছেন যে, বাংলার বর্ষা রবীন্দ্রনাথ আবিষ্কার করেছেন, ও-ঋতুর রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শে রবীন্দ্রনাথের ভারতী ভরপুর, তার ভীমমূর্তি আর তার কান্তমূর্তি, দুইই তাঁর

চোখে ধরা পড়েছে, দুইই তাঁর ভাষায় সমান সাকার হয়ে উঠেছে? নবাবি আমলের বাঙালি কবিরা এ ঋতুকে হয় উপেক্ষা করেছেন, নয় তাকে তেমন আমল দেননি। চণ্ডীদাসের কবিতায় কি বর্ষার স্থান আছে? আমার তো তা মনে হয় না। হয়তো বীরভূমে সেকালে বৃষ্টি হতো না, তাই তিনি ও-ঋতুর বর্ণনা করেননি। বাকি বৈষ্ণব কবিরাও এ বিষয়ে একরূপ নীরব। অবশ্য ঝড়বৃষ্টি না হলে অভিসার করা চলে না, সুতরাং অভিসারের খাতিরে তাঁদের কাব্যেও মেঘবজ্রবিদ্যুতের একটু-আধটু চেহারা দেখাতে হয়েছে; অর্থাৎ ও ক্ষেত্রে বর্ষা এসেছে নিতান্ত আনুষঙ্গিক ভাবে। অবশ্য এ বিষয়ে সেকালের একটা কবিতা আছে যা একাই একশো—

রজনী শাওন ঘন ঘন দেয়া গরজন
রিমিঝিমি শবদে বরিষে।
পালঙ্কে শয়ান রঙ্গে বিগলিত চীর অঙ্গে
নিন্দ যাই মনের হরিষে।।

সংগীত হিসেবে এ কবিতা গীতগোবিন্দের তুল্য। আর কাব্য হিসেবে তার অপেক্ষা শতগুণে শ্রেষ্ঠ।

এখন আমার কথা এই যে, আজ আমার মনের ভিতর দিয়ে যেসব কথা আনাগোনা করছে সেসব এতই বিচ্ছিন্ন এতই এলোমেলো যে, সেসব যদি ভাষায় ধরে তারপর লেখায় পুরে দেওয়া যায় তা হলে আমার প্রবন্ধ এতই বিশৃঙ্খল হবে যে, পাঠক তার মধ্যে ভাবের গোলকধাঁধায় পড়ে যাবেন। বাইরের ল অ্যান্ড অর্ডারকে আমরা যতই বিদ্রুপ করি, ভাবের ল অ্যান্ড অর্ডারকে না মান্য করে আমরা সাহিত্য তো মাথায় থাক, সংবাদপত্রেও লিখতে পারিনে। আর যদি এমন পাঠকও থাকেন যিনি বাংলাদেশের ছেলেভুলানো ছড়া-পাঁচালির অনুরূপ অসম্বন্ধ গদ্যরচনা মনের সুখে পড়তে পারেন তা হলেও আমি আজ মন খুলে লিখতে প্রস্তুত নই। অনেক কথা যা আজ মনে পড়ছে তার যা-কিছু মূল্য আছে তা আমার কাছেই আছে, অপর কারও কাছে নেই। বহুকাল-মৃত বহুকাল-বিস্মৃত কোনো শুকনো ফুলের পাপড়ি যদি হঠাৎ আবিষ্কার করা যায় তা হলে যে সেটিকে এককালে সজীব অবস্থায় সাদরে সঞ্চিত করে রেখেছিল, একমাত্র তারই কাছে সে শুষ্কপুষ্পের মূল্য আছে, অপরের কাছে তা বর্ণগন্ধহীন আবর্জনা মাত্র। মানুষের স্মৃতির ভিতরও এমন অনেক শুকনো ফুল সঞ্চিত থাকে যা অপরের কাছে বার করা যায় না। কিন্তু এমন দিনে তা আবিষ্কার করা যায়।

আবার ঘোর করে এল, বাতি না জ্বালিয়ে লেখা চলে না; আর কালির অপব্যয় করা যত সহজ বাতির অপব্যয় করা তত সহজ নয়। অতএব এইখানেই এ লেখা শেষ করি।

আবহমান

নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

যা গিয়ে ওই উঠানে তোর দাঁড়া,
লাউমাচাটার পাশে।
ছোট্ট একটা ফুল দুলছে, ফুল দুলছে, ফুল
সন্ধ্যার বাতাসে।

কে এইখানে এসেছিল অনেক বছর আগে,
কে এইখানে ঘর বেঁধেছে নিবিড় অনুরাগে।
কে এইখানে হারিয়ে গিয়েও আবার ফিরে আসে,
এই মাটিকে এই হাওয়াকে আবার ভালোবাসে।
ফুরয় না তার কিছুই ফুরয় না,
নটেগাছটা বুড়িয়ে ওঠে, কিন্তু মুড়য় না!

যা গিয়ে ওই উঠানে তোর দাঁড়া,
লাউমাচাটার পাশে।
ছোট্ট একটা ফুল দুলছে, ফুল দুলছে, ফুল,
সন্ধ্যার বাতাসে।